প্রথম অধ্যায়

মৈথিল সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

খৃষ্ট জন্মের অনেক আগে থেকে আর্যরা ভারতের মাটিতে এসে বসবাস শুরু করে। এরা প্রথমে সিন্ধু নদীর তীরে বসতি স্থাপন করে ও ক্রমে সমস্ত গাঙ্গেয় অববাহিকা ধরে ভারতের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। কুশী নদী এককালে গঙ্গার মূল অববাহিকা নদী। সুতরাং এই আর্যদের বসতি গঙ্গা ও কুশী নদীর অববাহিকা অঞ্চলে, বিশেষ করে নদী তীরবর্ত্তীস্থানে, ব্যাপকভাবে দেখা যায়। এই স্থানগুলি সাধারণভাবে এদেশীয় আদিম অধিবাসীদের বসবাসের স্থান থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত ছিল, তার কারণ প্রাচীন ভারতীয়রা বৈদিক ক্রিয়া কর্মে একেবারে অন্ধকারে ছিল। আর্যরা প্রতিদিন নানা প্রকার বৈদিক যাগযজ্ঞ ইত্যাদি লইয়াই সবসময় নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখত। প্রত্যেক যজ্ঞ-স্থানের জন্য একজন প্রধান নির্বাচিত করা হত এবং তারই আদেশ অনুসারে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম শেষ হত। এই প্রকারের বৈদিক ক্রিয়াকর্মে নিযুক্ত আর্যদেরকে ঋষি বলা হত। এই সমস্ত ঋষিদের মধ্যে প্রধানতঃ মনু, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, জামদগ্নি, পরাশর, কশ্যপ, সাবর্ণী, বৎস্য, ভরদ্বাজ, গৌতম, প্রভৃতির নাম আমরা জানতে পারি। এই সমস্ত ঋষিদের বংশধারা এখনও দেখতে পাই "গোত্র" এই পরিচয়ের মধ্যে। এই গোত্র কথাটির পরবর্ত্তী কালের পরিবর্ত্তিত রূপ। সঠিকভাবে এই 'গোত্র' কথাটির অর্থ বংশ পরম্পরায় ধরলেই সমধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ করে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে একই গোত্রে কোনও প্রকার বিবাহাদিরূপ শুভকর্ম হয় না, তার একটি মাত্র কারণ, একই বংশজাত বলে। অবশ্য অরক্ষণীয়া কন্যা অর্থাৎ কোনও মেয়ের অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নি) এর বিবাহ সম্বন্ধ হয়ত

সগোত্রীয় ছেলের সঙ্গে স্থির করে মেয়ের মা-বাবা অন্য গোত্রীয় কোনও আত্মীয়ের কাছে, এককড়ি মূল্যে বিক্রয় করে সেই অন্য গোত্রীয় শ্রেণীভুক্ত করে নেয় ও সেই আত্মীয় দ্বারা কন্যা সম্প্রদান করে বিয়ে দিচ্ছে, এমন ঘটনা দু'একটা ঘটতে দেখা গেছে। এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করে কালক্ষেপ করতে চাই না। আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় যে মৈথিলী সম্প্রদায় তার পরিচয় দেওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। দেখা যাচ্ছে যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের নানা প্রকার শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। যেমন মৈথিলী, কনৌজী, রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, প্রভৃতি। অঞ্চল বিশেষে বাস করার ফলে একেক শ্রেণীর ব্রাহ্মনেরা একেক প্রকার পরিচয় বহন করে চলেছে। কনৌজ দেশ থেকে আগত এবং মালদহ জেলায় বসবাসকারী ব্রাহ্মণদেরকে কনৌজী ব্রাহ্মণ বলে, সেই প্রাচীন কালে গৌড়ের মধ্যে গঙ্গার পূর্বধারকে বরেন্দ্রভূমি ও গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে অবস্থিত অঞ্চলকে রাঢ়ভূমি বলা হত। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ পরিবার এই দুই অঞ্চলের ভূমিতে বসবাস শুরু করে তাদেরকে যথাক্রমে বরেন্দ্রী ও রাঢ়ী বলা হয়। বর্তমানেও তাদের মধ্যে এই বিভাগ রয়েছে এবং অঞ্চল বিশেষে সাধারণত মহানন্দার উত্তর পূর্বপারে অবস্থিত অঞ্চলকে বরেন্দ্রভূমি বলা হয় এবং গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুরা প্রভৃতি বিস্তৃত অঞ্চলকে রাঢ়ভূমি বলা হয়। আর যে সমস্ত ব্রাহ্মণ মিথিলা থেকে এসে মালদহে বসবাস করছে তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে এক কথায় মৈথিলী ব্রাহ্মণ বলা হয়।

মিথিলা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, এই মিথিলা রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল একটা ঐতিহাসিক পটভূমি দিয়ে। মিথিলার প্রাচীন নাম ছিল বিদেহ। "মনুর নয়টি পুত্র ও একটি মেয়ে। এই নয় পুত্রের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ভাগ করে দেওয়া হয়। বড় পুত্র ইক্ষ্বাকু মধ্যদেশের রাজা হন এবং তাঁর রাজধানী হয়

অযোধ্যায়। ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমি বিদেহ রাজ্য জয় করেন। নিমির পুত্র 'মিথি' পরে এই বিদেহ দেশের রাজা হন এবং এই মিথির নাম অনুসারে বিদেহর নাম মিথিলা হয়।[১] প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদারের Ancient India নামক গ্রন্থে পাওয়া যায় - 'Ikshaku, the eldest son, obtained Madhyadesa, and was the progenitor of the solar race or dynasty with its capital or Ayodha. From Ikshaku's son Nimi(or Nemi) sprang the dynasty that reigned in Videha with its capital at Mithila, which is said to have been named after his son Mithi.'[2]

মিথিলা রাজ্যে বসবাসকারী ব্রাহ্মণদেরকে মৈথিলী বলা হয়। মিথিলা থেকে কামরূপ -আসাম পর্যন্ত অংশকে 'ত্রিহুত' বা 'তীরহোত্' বলা হত। এখনও তীরহোত্ কথাটির প্রচলন আছে।

অনুরূপভাবে বালীর পাঁচপুত্রের নাম অনুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পুন্ড্র - এই পাঁচটি - রাজ্যের বিভাগ হয়। পাঁচ পুত্র যথাক্রমে পাঁচ রাজ্যের রাজা হন। বালীর মৃত্যুর পর একমাত্র অঙ্গ রাজ্য পাঁচভাগে বিভক্ত হয়। এই অঙ্গ রাজ্যের রাজধানীর পুরাতন নাম 'মালিনী'। মালিনী নাম পরিবর্তিত হয়ে নাম হয় চম্পা বা চম্পাবতী। চম্পাবতীর বর্তমান নাম 'ভাগলপুর', ইহা-বিহারে অবস্থিত।[৩] মালদহ জেলা সৃষ্টির ইতিহাসের সঙ্গে ভাগলপুরের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

---

১. Mojumdar R.C. ANCIENT INDIA, Idiological Publishers & Book Sellers, Delhi. 1977, 8th edition P.68

২. ঐদেব - পৃ.৬৮

৩. ঐদেব - পৃ.৭০

মালদহ জেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা না করলে এই আখ্যায়িকাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কারণ খৃষ্টীয় সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মালদহ বলে কোনও জেলার অস্তিত্ব ছিল না। তবে, প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন বা গৌড় রাজ্যের মধ্যে মালদহ (বর্ত্তমানে পুরাতন মালদহ) বলে একটা শহরের নাম পাওয়া যায়। এই শহরের পাশেই তদানীন্তন বিখ্যাত গঞ্জ নিমাসরাই নৌবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হিসাবে পাওয়া যায়। ইহা মহানন্দা নদী ও কালিন্দ্রী নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৮০৮-০৯) ডঃ বি·হ্যামিল্টন্ যথাক্রমে রাজসাহী, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া, সাঁওতালপরগণা (দুমকা) জেলাগুলি থেকে কিছু কিছু ভূখণ্ড নিয়ে মালদহ জেলা গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী দিনাজপুর জেলার চারিটি থানা - মালদহ (পুরাতন মালদহ), গাজোল, বামনগোলা ও হবিবপুর (অংশবিশেষ), পূর্ণিয়া জেলা থেকে ৫টী থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, খরবা (চাঁচোল), রতুয়া, মাণিকচক ও কালিয়াচক এবং রাজসাহী জেলা থেকে ৭টী থানা - হবিবপুর (অংশবিশেষ), ইংরেজবাজার, ভোলাহাট, নাচোল, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর ও নবাবগঞ্জ - মোট ১৫টী থানা নিয়ে এই মালদহ জেলা গঠিত হয়। দেশ বিভাগের ফলস্বরূপ জেলার ১৫টী থানার মধ্যে ৫টী থানা - ভোলাহাট, নাচোল, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর ও নবাবগঞ্জ পূর্ব-পাকিস্তানের (বর্ত্তমান বাংলাদেশের) অন্তর্গত হয়। ফলে মালদহ জেলায় মোট ১০টী থানা বর্ত্তমান থাকে। মালদহ জেলার উৎপত্তির সময় থেকে (১৮১৩ - ১৮৭৬ খৃঃ) এটা রাজসাহী বিভাগের অধীনে ছিল। ১৮৭৬ - ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ ভাগলপুর বিভাগের অর্ন্তভুক্ত হয়। প্রশাসনিক সুবিধার্থে পুনরায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ থেকে দেশ বিভাগ অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হওয়া পর্য্যন্ত (১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত) রাজসাহী বিভাগের অন্তর্গত ছিল। যদিও ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট দেশ ইংরাজ শাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীনতার ঘোষনা করা হয় (অবিভক্ত স্বাধীনতা নয়, বিভক্ত স্বাধীনতা), মালদহ জেলা পূর্ব-পাকিস্তানের

অধীনেই থেকে যায়। পরে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট তদানীন্তন বাংলার গভর্ণর জেনারেলের স্যার - র‍্যাড্‌ক্লিফের ঘোষণা অনুযায়ী মালদহ জেলার ৫টী থানা বাদে সমগ্র জেলার স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। উপরোক্ত ৫টা থানা পূর্ব-পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) অন্তর্ভুক্ত হয়।[৪]

মালদহ জেলার চৌহদ্দী বা সীমান্তবর্তী জেলা, প্রদেশ বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে - উত্তরে পশ্চিম দিনাজপুর (উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর) জেলাও বিহারের পূর্ণিয়া জেলা, পূর্বে পশ্চিম দিনাজপুর (দক্ষিণ দিনাজপুর) জেলা এবং বাংলাদেশের রাজসাহী জেলা, ~~দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ জেলা ও বাংলাদেশের রাজসাহী জেলা;~~ দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ জেলা ও বাংলাদেশের রাজসাহী জেলা এবং পশ্চিমে বিহারের সাঁওতাল পরগণা(দুমকা) এবং সাহেবগঞ্জ জেলা। বর্ত্তমানে মালদহ জেলায় ১১টী থানা রয়েছে। যথা - ইংরেজবাজার, মালদহ, মাণিকচক, রতুয়া, খরবা (চাঁচোল), হরিশ্চন্দ্রপুর, গাজোল, বামনগোলা, হবিবপুর, কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর। এছাড়া দুটি পুলিশ চৌকী - ঘোথাবাড়ী ও গোলাপগঞ্জ, স্থানীয় প্রশাসন ব্যাপারে কালিয়াচক থানার সাহায্যকারী থানা হিসাবেই কাজ করে চলেছে।

মালদহ জেলায় একটি মাত্র মহকুমা রয়েছে, যার প্রধান কার্য্যালয় হল, ইংরেজবাজার। এই জেলার প্রধান কার্য্যালয় (জেলা সমাহর্তা অফিস) ইংরেজবাজারেই অবস্থিত। অতি আধুনিককালে আরও একটি মহকুমার নাম ঘোষিত হয়েছে, যার প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত হতে চলেছে চাঁচোলে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এই নূতন মহকুমার

---

৪. কুমার কে.এস. রাজেন্দ্র, জেলা সমাহর্তা, মালদহ, Glimps on the District Malda, সমাহর্তা অফিস, মালদহ, ১৯৮৬(২।৩।৮৬) প্রতিবেদন সংখ্যা (ম্যাগাজিন)

সদর কার্য্যালয়ের শুভ উদ্বোধন এখনও পর্য্যন্ত হয় নি। জেলার লোকসভার আসন সংখ্যা মোট ১টী এবং বিধান সভার আসন সংখ্যা মোট ১১টী। লোকসভার আসনের নাম মালদহ এবং বিধানসভার আসনের নাম - কালিয়াচক-১, কালিয়াচক-২, সুজাপুর, মাণিকচক, ইংরেজবাজার, মালদহ, রতুয়া, খরবা, গাজোল, বামনগোলা ও হবিবপুর। মালদহের মধ্যে তথা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কালিয়াচক থানা সবচেয়ে বৃহত্তম থানা এবং একমাত্র এই থানার অধীনেই রয়েছে ৩টী বিধানসভার আসন এবং আরও কিছু পঞ্চায়েত অংশ মাণিকচক আসনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এই বৃহত্তম থানাকে বর্ত্তমানে দু'টি থানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং রূপান্তরিত থানার নাম - বৈষ্ণবনগর।

১৯৮১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী তথ্য অনুযায়ী এই জেলার ভৌগোলিক পরিবেশ ও জনগননার পরিসংখ্যান দেওয়া হল।[৫]

সীমানা :

১) ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেলের মতে - ৩৭১৩ বর্গ কিঃমিঃ
২) ভারতের ভূমি পরিসংখ্যান অধিকর্তার মতে- ৩৬০৫ "
৩) ১৯৮১ খৃঃ জনগণনার তথ্য অনুসারে - ৩৫৬৪ "

ভৌগলিক অবস্থান :

উচ্চতা - $২৫^{0}৩৩'০৬"$ $২৪^{0}৪০'২০"$
দূরত্বের - $৮৮^{0}২০'১০"$ $৮৭^{0}৪৫'৫০'$

মোট জন সংখ্যা : ২০, ৩৫, ০০১ জন
পুরুষ : ১০, ৪৩, ৬৩৪ "
স্ত্রী : ৯, ৯১, ৩৭৫ "

৫. Census of India, Hand Book, Election Deptt. Malda, W.B. 1981, 23 series.

এর মধ্যে ১) তফশিলী জাতি : ৩, ৩৫, ৮২৪ জন

২) তফশিলী উপজাতি : ১, ৪৮, ১৪৬ জন

শিক্ষিতের হার - পুরুষ - ৩১.৪%

স্ত্রী - ১৪.২%

জনবসতি (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) - ৫৪৮ জন

ব্লক স্তরে অফিসের সংখ্যা - ১৫ টী

গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সংখ্যা - ১৪৭ টী

জেলার মোটা মৌজার সংখ্যা - ১৭১৪ টী

মোট গ্রামের সংখ্যা - ১৬১১ টী

অধিকতম বৃষ্টিপাতের পরিমাণ - ১৭৬০.৪ মিঃমিঃ

নিম্নতম বৃষ্টিপাতের পরিমাণ - ৬৭৩.৪ মিঃ মিঃ

মালদহ জেলাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে - পূর্ব ও পশ্চিম। পূর্বভাগে অবস্থিত বরিন্দ বা বরেন্দ্রভূমি অঞ্চল। এখানকার মাটী শক্ত ও অনুর্বর। পশ্চিম-ভাগকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়েছে - উত্তর ও দক্ষিণ। উত্তর ভাগকে নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চল বা 'টাল' বলা হয়। দক্ষিণ ভাগ উর্বর ভূমি বা দিয়ারা অঞ্চল অর্থাৎ গঙ্গা বিধৌত অঞ্চল। মালদহের এই দক্ষিণ অংশেই ঘনজনবসতি দেখা যায় এবং এই অঞ্চলের পাশ দিয়ে গঙ্গা নদী প্রবাহিত হয়েছে। এখানে অনেকগুলি নদীর অবস্থান পাওয়া যায়। যেমন - গঙ্গা, কুলহর, কালিন্দ্রী, মহানন্দা, ভাগীরথী (গৌড়গঙ্গা), পাগলা, টাঙ্গন, পুনর্ভবা প্রভৃতি। গঙ্গানদী গদাইতে মালদহের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফরাক্কার অল্প দূরে চর বাবুপুর নামক স্থান পর্য্যন্ত গেছে, কুলহর - বিহারের পার্বত্য এলাকা থেকে

বেরিয়ে এসে যথুরাপুর হয়ে গঙ্গায় মিশেছে, কালিন্দ্রী - যথুরাপুরের কাছে কালীতলা ঘাটের কাছে ফুলহর থেকে উৎপন্ন হয়ে জমুতির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নিমাসরাইতে মহানন্দার সঙ্গে মিশেছে, মহানন্দা - কুশিধার কাছে মালদহে প্রবেশ করে সঙ্গে বেশ কিছু উপনদীর জলধারা নিজের মধ্যে গ্রহণ করে 'নিমাসরাই' হয়ে বাংলাদেশের মধ্যে প্রবেশ করেছে ও গোদাগাড়ীতে পদ্মার সঙ্গে মিশেছে। ভাগীরথী - বাঙ্গীটোলার কাছে মোহনা নামক স্থানে গঙ্গা থেকে উৎপন্ন হয়ে হাড়িয়াগড় - সাদুল্লাপুর-মহদীপুর হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই নদীর পাড়ে অল্পমাত্র যায়গায় উত্তর-বাহিনী রয়েছে। যায়গাটা হল হাড়িয়াগড়ের পূর্ব-দক্ষিণে 'কুচাই' নামক স্থানে এই 'উত্তর-বাহিনী'ধারা বর্ত্তমান। পাগলা-বাঙ্গীটোলার কাছে মোহনায় গঙ্গা নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে মোথাবাড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। টাঙ্গন - বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুরের(পশ্চিম দিনাজপুরের) রায়পাড়া হয়ে আইহোর কাছে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মহানন্দায় মিশেছে। পুনর্ভবা - দক্ষিণ দিনাজপুরের(পশ্চিম দিনাজপুরের) চেচাড়া হয়ে মালদহের নবাবনগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তিলাসনের কাছে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এছাড়া ব্রাহ্মণী, ছিরমতী, নাগর, আতাই, বেহুলা, প্রভৃতি নদী পশ্চিম দিনাজপুরের মধ্য দিয়ে মালদহে প্রবেশ করেছে। এর মধ্যে নাগর, ছিরমতী প্রভৃতি নদী মহানন্দায় মিশেছে, ব্রাহ্মণী পুনর্ভবার সঙ্গে মিশেছে ও পরে পুনর্ভবা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

রেলপথ : পূর্বে অর্থাৎ স্বাধীনতার পূর্বে অযোধ্যা-ত্রিহুত মেল কাটিহার হয়ে মালদহ ও সিঙ্গাবাদ দিয়ে বর্ত্তমান বাংলাদেশের আমপুরা জংশন পর্য্যন্ত যাতায়াত করত। বর্ত্তমানে এই রেলপথটি মালদহ - সিঙ্গাবাদ ঐচ্ছিক ভাবে যাতায়াত করছে। এই রেল পথটির মিটারগেজ লাইন এখনও বর্ত্তমান। অল্পদিন হল সিঙ্গাবাদ হয়ে বাংলাদেশের

মধ্যে অনির্দিষ্ট ভাবে যাতায়াতের ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। এছাড়া নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে মালদহ টাউন স্পর্শ করে কলিকাতা-দিল্লী ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের জন্য রেলপথ (ব্রডগেজ) লাইন চালু রয়েছে। মালদহের সুনামধন্য শ্রীযুক্ত এ·বি·এ·গণি খাঁনের মহানুভবতায় মালদহ টাউন ষ্টেশন থেকে কলিকাতা অভিমুখে ই·আই·আর রেলপথে রূপান্তরিত হয়েছে, আর মালদহ টাউন-ষ্টেশন থেকে নিউজলপাইগুড়ি অভিমুখে এন·এফ· আর রেলপথ।

মালদহ থানা এবং গাজোল থানার অংশ বিশেষে বর্ত্তমান পান্ডুয়া ও আদিনা অবস্থিত। এবং এটাই ছিল প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধন রাজ্যের রাজধানী। পৌন্ড্রবর্ধন রাজ্যের প্রজারা ছিল বেদ-বিধি বহির্ভূত। ফলে আর্যদের মতে এরা ছিল অনার্যজাতি। অনার্য-অধ্যুষিত এই রাজ্যে আর্যদের কোনও বসতি ছিল না। পুন্ড্রবর্ধন রাজ্য অনেক প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছিল, সেই তুলনায় গৌড়রাজ্য অনেক পরবর্ত্তীকালের। ঋগ্বেদ যখন রচিত হয় সেই সময়ে এই বেদের মধ্যে পুন্ড্রবর্ধন রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এর উল্লেখ আছে। তৎকালীণ করতোয়া ও গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থানকেই পুন্ড্রবর্ধণ রাজ্য বলা হয়। অর্থাৎ এই রাজ্যের সীমানা একদিকে করতোয়া নদী (জলপাই গুড়ি জেলার মধ্যে অবস্থিত, শিলিগুড়ি থেকে বাসে জলপাইগুড়ি যেতে করতোয়া নদী রয়েছে) আর একদিকে গঙ্গা নদী। এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা এখনও এখানে 'পুন্ড্র' এই নামেই বসবাস করছে। মনুসংহিতায় আছে ক্রিয়ালোপহেতু ও ব্রাহ্মণগণের অদর্শন জন্য কতিপয় ক্ষত্রিয়জাতি আচারভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। আচারভ্রষ্টহেতু বৃষলত্বপ্রাপ্ত হয়। মহা-ভারতের শান্তিপর্বে পুন্ড্রজাতির উল্লেখ আছে। এই জাতিকে দস্যুজীবি বলা হয়েছে।[৬]

৬· চক্র-বর্ত্তী রজনীকান্ত, গৌড়ের ইতিহাস - এ·পি·পাবলিশার্স, ২।৭৩, এ·সি·মার্কেট, মালদহ, ১৯৮৩, সম্পাদিত সংস্করণ পৃ·২৬

যথা - "পৌণ্ড্রা পুলিন্দা রমঠাঃ কাম্বোজাশ্চৈব সর্বশঃ ।
যদ্বিধৈশ্চ কথং স্থাপ্যা সর্বে বৈ দস্যুজীবিনঃ ॥"
- মহাভারতের শান্তিপর্ব - ৬৫ অধ্যায়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে বিশ্বামিত্রের পুত্র পুণ্ড্রগণ হ'তে পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্রদেশের নামকরণ হয়েছে, পুণ্ড্রগণ দস্যুজীবি।

ভাগবৎমতে পুণ্ড্রগণ যযাতির পুত্র ও অসুরবংশীয়।

মহাভারতের শান্তিপর্বে ২৯তম অধ্যায়ে আছে পুণ্ড্রগণ জামদগ্ন্যের(পরশুরামের) ভয়ে গিরি কন্দরে লুক্কায়িত ছিল। ব্রাহ্মণগণের অদর্শনে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়।

সুতরাং এহেন পুণ্ড্রদেশে আর্য-সমাজভুক্ত বাহ্মণদের বাস ছিল না। পরে খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতকে মগধের প্রদ্যোতন বংশীয় রাজা ভোজ গঙ্গা পুলিনে গৌড়নগর স্থাপন করেন। চীন পরিব্রাজক হিউ-য়েন-সাং এর বিবরণীতে পাওয়া যায় তাঁর এদেশ পরিভ্রমণের অব্যবহিত পূর্বে কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক পুণ্ড্র ও গৌড়ের রাজা ছিলেন। এঁর আর এক নাম ছিল নরেন্দ্র গুপ্ত। রাজা শশাঙ্ক নিজ রাজধানী কর্ণসুবর্ণে যজ্ঞ করার জন্য প্রথমে সরড়ুতীরে বসবাসকারী বালার্ক সমাজ থেকে - বিষ্ণু, সনাতন, সুযজ্ঞ, শঙ্কর, দেবধর, সুধর্মা, বাসুদেব, প্রজাপতি, চতুর্ভুজ, লোকেশ, চক্রপাণি ও মাধব এই বারজন শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণকে এই গৌড়মণ্ডলে আনেন।[৭]

পুণ্ড্ররাজ্য ও গৌড়মণ্ডলে এই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণেরাই প্রথমে সূর্য্যপূজার প্রচার করে। মালদহের বিভিন্ন স্থানে, অনুসন্ধান করে পাওয়া যায় যে, সূর্যপূজার

---

৭. তদেব - পৃ.৩৮

যে ব্যাপকতা ছিল তার প্রমাণ স্বরূপ বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া সূর্যমূর্তি। ইংরেজবাজার শহর থেকে প্রায় ৮ কি: মি: উত্তরে মাধাইপুর নামক একটি গ্রাম আছে। সেখানে একটা কালীমন্দির রয়েছে এবং এই মন্দিরটি মাধাইপুরের কালীবাড়ি বলেই সমধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। এই কালী মন্দিরে অক্ষত অবস্থায় একটা সূর্য্যমূর্তি রাখা আছে। এছাড়া মালদহ জেলায় কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতে ব্যাপকভাবে কার্ত্তিক ঠাকুরের পূজা হয়ে থাকে। এই পূজা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও জাঁকজমকের সঙ্গেই করা হয়। শক্তিধর দেবতা হিসাবেই কার্ত্তিক ঠাকুরের পূজা। দীর্ঘদিন যাবৎ অর্থাৎ সেই - পুন্ড্রবর্ধন রাজ্যের সময় থেকেই এই পূজার প্রচলন হয় এবং আজ পর্য্যন্তও সাড়ম্বরে পালিত হয়। মালদহ ছাড়া অন্য জায়গায় কার্ত্তিক ঠাকুরের পূজার বিশেষ প্রচলন। এখনও মালদহ শহরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ফুলবাড়িতে মনমোহন সাহার বাড়ীতে ধূমধামের সঙ্গেই এই পূজা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে এবং এই উদ্দেশ্যে বিরাট মেলাও বসে এবং এই মেলার স্থায়িত্ব প্রায় একমাস ব্যাপী। বিভিন্ন প্রকার কাঠের আসবাব ও মিনিষপত্র - এই মেলার প্রধান আকর্ষণ। কিংবদন্তী - যে কার্ত্তিক ঠাকুর মেলায় 'ভেঁটের খই' অবশ্যই খেতে হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রচুর ভেঁটের খইয়ের দোকান বসে।

৭৩০ খৃষ্টাব্দে আদিশূর গৌড়রাজ্য অধিকার করে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। ৭৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্য্যন্ত কোনও লিখিত তথ্য - পাওয়া যায় না। কিন্তু আদিশূরের সময় থেকে কিছু কিছু লিখিত তথ্য পাওয়া যায়। এই তথ্য অনুসারে দেখা যায় যে - তিনি গৌড় রাজ্য অধিকার করার সময়ে এই রাজ্যে বৌদ্ধ প্রভাব প্রবলভাবে বিরাজিত ছিল। প্রজাদের মধ্যে সকলের ইচ্ছা না থাকলেও, বাধ্য হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করেছিল। আদিশূর শূরবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ও হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন। সেই কারণে গৌড়ে বৌদ্ধ প্রভাবকে নির্মূল করে, হিন্দুধর্মকে প্রবর্ত্তন করে, বেদ বিধি ক্রিয়াকর্ম প্রচলনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্র লিখেছেন -

"আগমৎ ভারতং বর্ষং দারদাৎ স রবিপ্রভঃ।
জিত্বা চ বৌদ্ধ রাজানাং তথা গৌড়াধিপ বলান্।।"

সুতরাং রাজা আদিশূর বৌদ্ধদেরকে, বলে নিজ রাজ্য থেকে উৎখাৎ করার জন্য ও হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কন্যোজ বা কনৌজ থেকে প্রথমে ৫ (পাঁচ) জন ব্রাহ্মণকে (বৈদিক ব্রাহ্মণ) এই গৌড় রাজ্যে নিয়ে আসেন ও তাদের দ্বারা বৈদিক যজ্ঞ করান। কথিত আছে যে এই যজ্ঞের ফলেই আদিশূরের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সেই পুত্রের নাম 'ভূশূর'।[৮]

রায়মুকুট বৈদ্যকুলপঞ্জিকাতে দেখা যায় -

"ভূশূর নামক পুত্র আদি নৃপতির।
মুনি পঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যার স্থির।"

-সেই কালে বৈদিক ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদেরকে 'মুনি' বলে অভিহিত করা হত।

পঞ্চব্রাহ্মণ যজ্ঞকর্ম শেষ করে নিজ দেশে প্রস্থান করে। কিন্তু বৌদ্ধ প্রভাবিত ও অনার্য অধ্যুষিত এই গৌড় ও পুন্ড্র থেকে তারা ফিরে গেলে, নীচ যাজী বলে কণৌজের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তাদেরকে সমাজচ্যুত করে। ফলে এই ব্রাহ্মণগণ নিজদেশে থাকতে না পেরে সপরিবারে পুনরায় গৌড়ে ফিরে আসে ও গৌড় রাজের শরণাপন্ন হয়। গৌড় রাজ তাদের ভূমি দান করে ও তারা এখানে বসতি স্থাপন করে। পরে গৌড় রাজ্যে, গৌড় রাজের বদান্যতার সুখ্যাতি জেনে, ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণদের আগমন ঘটতে থাকে। ব্রাহ্মণদের আগমনের ধারা রাজা বল্লালসেনের আমল পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অনেক কায়স্থরা এই গৌড়মন্ডলে আসে ও বসবাস শুরু করে। গৌড়রাজের অনুগ্রহে

৮. তদেব - পৃ.৫২

আগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা সকলেই বসবাসের জন্য যায়গা ও ভরণপোষণের জন্য ভূসম্পত্তি লাভ করে। সমগ্র গৌড়রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এর এক ভাগকে বরেন্দ্র অঞ্চল আর একভাগকে রাঢ় অঞ্চল বলা হয়। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ পরিবার, বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাস করে তাদেরকে বারেন্দ্র শ্রেণী ও রাঢ় অঞ্চলে বসবাসকারীকে রাঢ়ী শ্রেণী বলা হয়। অথচ উভয় শ্রেণীর লোকই গৌড়ে আসার পূর্বে একই প্রদেশে বাস করত। সমস্ত গৌড় রাজ্য, সেই সময়ে ত্রিহুতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গৌড়রাজ বল্লালসেনের সময় পর্য্যন্ত বহু ব্রাহ্মণ মিথিলা থেকে গৌড় রাজ্যে আসে ও রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে বিভিন্ন স্থানে বসবাস শুরু করে। সেই সময়ে প্রচুর ব্রাহ্মণ পরিবারের গৌড়ে তথা মালদহে আগমণ ঘটে এবং রাজার দাক্ষিণ্যে প্রচুর নিষ্কর জমি লাভ করে ও গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থানে বসবাস শুরু করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মিথিলার রাজধানী দ্বারভাঙ্গা পর্য্যন্ত গৌড় রাজ্য বিস্তৃত ছিল এবং সমগ্র অঞ্চলকেই বঙ্গ বলা হত। উত্তরভারত থেকে বঙ্গদেশে প্রবেশ করার একমাত্র এটাই ছিল প্রকৃষ্ট রাস্তা আর এজন্যই তখন বলা হত "দ্বারবঙ্গ"। বর্ত্তমানে এই দ্বারবঙ্গই রূপান্তরিত হয়েছে দ্বারভাঙ্গা নামে। বর্ত্তমানে সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করতে হলে একমাত্র ফরাক্কার গঙ্গা-সেতু পার হয়ে উত্তরবঙ্গের মাটিতে পা দিতে হয় বা প্রবেশ করে। এই স্থানটি মালদহের অন্তর্গত। এই সমস্ত কারণেই মালদহকে উত্তরবঙ্গের দ্বার বা প্রবেশদ্বার বলা হয়। (দ্বারভাঙ্গার সঙ্গে মালদহের তুলনা একটা প্রমানস্বরূপ উত্থিত করা হল)।

"প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই সীমা দক্ষিণে গঙ্গার তট বাহিয়া একেবারে দ্বারভাঙ্গা জেলার পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দ্বারভাঙ্গা ত দ্বারবঙ্গ (বা বঙ্গের দ্বার) শব্দেরই আধুনিক বিকৃতরূপ। পূর্ণিয়া সরকার তো আকবরের আমলেও বাংলা সুবার

অন্তর্গত ছিল। তাছাড়া কি ভূমি প্রকৃতিতে, কি প্রাচীন ভাষায় উত্তর বিহার ও মিথিলার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ বা গৌড় - পুণ্ড্র - বরেন্দ্রীর পার্থক্য অল্পই ছিল। পঞ্চদশ - ষোড়শ শতকে মিথিলাই ছিল অন্যতম বিদ্যা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র, যাকে বাংলার পণ্ডিতেরা পরমতীর্থ বলিয়া মনে করিতেন। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি বাঙালীরও পরম প্রিয় কবি। উত্তরবঙ্গের এবং শ্রীহট্টের কোথাও কোথাও বহুদিন পর্য্যন্ত মৈথিল স্মৃতিরও প্রচলন ছিল, এখনও আছে, বাচস্পতি মিশ্রের স্মৃতি - এখনও শ্রীহট্টের কোনও কোনও টোলে পঠিত হইয়া থাকে। প্রচুর প্রাচীন পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায়। শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে বাচস্পতি মিশ্রের স্মৃতি-গ্রন্থের অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। এই দুইভূমির অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ ও উত্তর বিহারের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান রচিত হয়েছে মধ্যযুগে। প্রাচীনকালে এই দুই ভূমি একই ভূমি বলিয়া গণ্য হইত। উত্তর বিহারে দক্ষিণ সীমা ধরিয়া রাজমহল পাহাড়ের (তিন পাহাড়) ভিতর দিয়া মালদহের পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা ঘেঁষিয়া গঙ্গা বাংলাদেশে আসিয়া ঢুকিয়াছে।" [১]

"প্রাচীন বাংলার সীমা নির্দেশ ছিল উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় ধৃত নেপাল, সিকিম ও ভোটান রাজ্য, উত্তর পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিমদিকে দ্বারবঙ্গ পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্ত্তী সমভূমি, পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া - ত্রিপুরা - চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী - বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্য্যন্ত, পশ্চিমে রাজমহল - সাঁওতাল পরগণা - ছোটনাগপুর - মালভূম - ধলভূম - কেওঞ্ঝর - ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই প্রাকৃতিক সীমা

স্মৃতি - স্মৃতিশাস্ত্র। সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষার অন্যতম পাঠ্যপুস্তক। প্রধানতঃ আদ্য-মধ্য ও উপাধি - এই তিনভাগে বিভক্ত। তিন বিভাগে পাশ করলে 'স্মৃতিতীর্থ' উপাধি লাভ হয়।

১. রায় নীহাররঞ্জন বাঙালীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ ভবন। ৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলি-৭, ১৯৮০, ৩য় সংস্করণ, পৃ.৮৭

বিধৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাঙলার গৌড় - পুণ্ড্র - বরেন্দ্রী - রাঢ় - সুহ্ম - তাম্রলিপ্তি - সমতট - বঙ্গ - বঙ্গাল - হরিকেল প্রভৃতি জনপদ।" [১০]

উপরে বর্ণিত পংক্তি দুইটি থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে মৈথিলীরা আদৌ বিহারের অধিবাসী অথবা বিহারী নয় এবং মিথিলা কোনও কালেই বিহারের অধীনে ছিল না। বরং গৌড়ের অধীনে ছিল। আর গৌড় ছিল বাংলার রাজধানী এবং মিথিলাও বাঙলাতেই অবস্থিত ছিল। কারণ সেই সময়ের ঐতিহাসিক উল্লেখে পাওয়া যায় যে সমগ্র বাঙলা দুইভাগে বিভক্ত ছিল - বঙ্গ ও বঙ্গাল। বগুড়া ও তাম্রলিপ্তি এবং এর পরের অংশকে বঙ্গাল বলা হত; আর রাঢ় - বরেন্দ্র - মিথিলা বা দ্বারভাঙ্গা বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমগ্র বঙ্গকে ত্রিহুত বা তিরহোত বলা হত। গৌড় শব্দে মালদহে রূপান্তরিত হয়। এই মালদহ জেলা কোনওকালেই বিহারের মধ্যে ছিল না। বর্ত্তমানে পূর্ণিয়া বিহারের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সেই সময়ে পূর্ণিয়া বিহারের মধ্যে ছিল না বরং বাঙলা সুবার অধীনে ছিল। আকবরের শাসনকালের ইতিহাসই এর সাক্ষ্য বহন করে আছে। আমাদের লক্ষ্য করার প্রধান বিষয় হল যে কি কি কারণে এবং কি কি সুযোগ পেয়ে মৈথিলী ব্রাহ্মণেরা মালদহে এসেছে এবং এই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা সারা ভারতের একমাত্র মিথিলার পরেই এই মালদহ জেলায় স্থান লাভ করেছে - এই তথ্যটীর প্রমাণ করাই হবে আমার গবেষনার উদ্দেশ্য। আপাতত মালদহের পরিবর্ত্তে গৌড় নাম উল্লেখ করাই বোধ হয় সঠিক হবে। কারণ এই সম্প্রদায়ের লোকজন মালদহে আসে নাই, এসেছিল গৌড়ে।

৭৩০ খৃষ্টাব্দে আদিশূর গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করে গৌড়ের রাজা হন। এই সময় সমগ্র গৌড় রাজ্য, পূর্ববর্ত্তী রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়, বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। হিন্দু ধর্ম্ম প্রায় বিলুপ্ত হয়েছিল এবং হিন্দুধর্ম্মীর ভয়ে নিজেরা আত্মগোপন

---

১০. তদেব পৃ.৮৯

করতে বাধ্য হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল মগধ। এই মগধ রাজ্যের বর্তমান নাম বিহার। বৌদ্ধ মন্দিরগুলিকে বিহার বলা হয়। এই অনুসারে মগধের পরবর্তী নাম বিহার রাখা হয় এবং এখনও এই রাজ্য বিহার নামেই বর্তমান রয়েছে। আদিশূর রাজা হয়েই অনুভব করলেন যে গৌড় রাজ্য সামগ্রিক ভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রভাবে প্রভাবিত এবং হিন্দু ধর্মের কোনও চিহ্ন নেই। এই অবস্থা থেকে গৌড় রাজ্যকে উদ্ধার করতে মনস্থ করলেন এবং হিন্দু ধর্ম স্থাপন করার জন্য সচেষ্ট হলেন। ফলে হিন্দু ধর্মকে পুনরায় স্থাপন করার জন্য সচেষ্ট হলেন। [redacted] হিন্দুধর্মকে পুনরায় স্থাপন করতে ও প্রচার করার উদ্দেশ্যে কণৌজ বা মিথিলা থেকে পাঁচজন বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে আদিশূরের সময়েই পুন্ড্রবর্ধন রাজ্য গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং পুন্ড্রবর্ধন সহ সমগ্র রাজ্য গৌড় নাম লাভ করে। ফলে আদিশূরের আমল থেকেই, ঐতিহাসিক পরিচিতি হিসাবে, মিথিলা থেকে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের গৌড়ে আগমন ঘটতে থাকে। এই আগমন প্রবাহ, দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ রাজা বল্লাল সেন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। প্রত্যেক আগত ব্রাহ্মণ পরিবারই গৌড় রাজের আনুকূল্য লাভ করেছিল ও প্রায় সকলেই বহু নিষ্কর জমি ও গ্রাম দান হিসাবে লাভ করেছিল। এই সমস্ত দানে পাওয়া জমি ও গ্রামের কোনও চৌহদ্দীর উল্লেখ ছিল না। সুতরাং যে যতটা ও যেভাবে পেরেছে, নিজেদের প্রাপ্ত জমি বা গ্রামকে ইচ্ছা মত ভোগ দখলের সীমানা বাড়িয়ে ভোগ করে চলছিল।

ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে প্রত্যেক মৈথিলী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অনেক কায়স্থ গৌড়ে এসেছিল। ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন গঙ্গাস্নান - তর্পন ইত্যাদি রুচি ও ক্রিয়াকর্মে আজীবন অভ্যস্ত বলে তাদের বাসস্থান ছিল নদীতীরবর্তী স্থানে। এই কারণে মালদহের মধ্যে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত গ্রামগুলির অবস্থিতি, নদীতীরবর্তী

স্থানেই দেখা যায়। অবশ্য বর্ত্তমানে গ্রামগুলিকে যে নদীর তীর থেকে দূরে দেখতে পাওয়া যায় তার একমাত্র কারণ নদীর প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের ফলস্বরূপ। আরও বিভিন্ন ভাবে তদন্তে জানা গেছে যে বিশেষ করে গৌড়ে এই সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণদের ব্যাপকভাবে আগমন ঘটেছে ১১১৯ খৃঃ থেকে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে এর মধ্যে। সেই সময়ে গৌড়ের রাজা ছিলেন সুনামধন্য ও ব্রাহ্মণদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বল্লালসেন। তাঁর আমলে আসা ব্রাহ্মণদের অধিকাংশই রাজকার্য্যে কাজ করার অনুমতি পেয়েছিল ও রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়েছিল। সেন বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বল্লালসেন। তিনি অত্যন্ত গঙ্গা স্নানের ভক্ত ছিলেন। সেই সময়ে অমৃতির নিকট গঙ্গা নদীর প্রবাহের সঙ্গে কালিন্দ্রী নদী মিশেছিল ও একসঙ্গে প্রবাহিত হয়ে নিমাসরাইতে মহানন্দার সঙ্গে মিশেছিল। গঙ্গা স্নানের সুবিধার্থে ও গঙ্গার আবহাওয়ায় বাস করার প্রলোভনে, মালদহ শহর থেকে রাজমহল গামী বড় সড়কের ধারে ও বর্ত্তমান মালদহ শহর থেকে ৫ মাইল দূরে, সড়কের অল্প উত্তরে পিছলী গঙ্গারামপুর নামক স্থানে রাজধানী নির্মান করে বসবাস শুরু করেন। এতদিন গৌড়ের রাজধানী ছিল মহানন্দার পাড়ে বর্ত্তমান নরসুটা নামক গ্রামের কাছে। সেই সময় গঙ্গা প্রবাহ পিছলী গঙ্গারামপুরের পাশ দিয়ে বর্ত্তমান মাণিকপুর হয়ে ও গোধরাইল বিল দিয়ে ভাতিয়া দিয়ে প্রবাহিত হত। বর্ত্তমানে মালদহের রবীন্দ্রভবনের অল্পদূরে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের উপর একটি সেতু রয়েছে। এই সেতুটির নাম গোধরাইল সেতু বা ব্রীজ। বর্ত্তমানের এই গোধরাইল সেতুই ছিল এককালের গঙ্গার মূল প্রবাহধারা। রবীন্দ্রভবনের কাছে অবস্থিত কৃষ্ণকালীতলা সেই সময়ের গঙ্গার পারে অবস্থিত অর্থাৎ এই স্থানের পাশ পর্য্যন্ত গঙ্গা নদী বিস্তৃত ছিল। ফলে গৌড়ের রাজধানীর অবস্থানও ছিল গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে। বর্ত্তমানে যে স্থানে ভাতিয়ার বিল (বেশীর ভাগ অংশই বর্ত্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত রয়েছে) রয়েছে, সেই স্থানে একটি প্রসিদ্ধ নগরী ছিল। এই

নগরীর নাম ভাটিয়া নগর। প্রচুর ব্রাহ্মণ পরিবার এখানে বসবাস করত। অবশ্য পিছলী গঙ্গারামপুরে রাজধানীকে কেন্দ্র করে অনেক ব্রাহ্মণ বসতি ছিল। কালের পরিবর্তনে গঙ্গার করাল গ্রাসে এই নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ও বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলাভূমিতে পরিণত হয়। এই বিস্তীর্ণ জলাভূমিকেই, বর্তমানে ভাটিয়ার বিল বলে।

বিভিন্নভাবে আলোচনা করে ও ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে মিথিলার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোকেরা গৌড় রাজ্যে আগমন করে। প্রথমেই গৌড় রাজার আনুকূল্যে ও বদান্যতায় তাদের বাসস্থান ও জিবিকার সাশ্রয় হয়। পরে বিভিন্ন প্রকার রাজকার্যে ও রাজসভায় স্থানলাভ করে। আগত ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেক পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা রাজসভায় যোগদান করে গৌড়রাজসভায় সংস্কৃত শিক্ষা ও চর্চার প্রসার ঘটান। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে মিথিলা গৌড় তথা বাংলারই অঙ্গ এবং মিথিলা সেই সময়ে ছিল সমগ্র বাংলার বিদ্যাশিক্ষার পীঠস্থান। অনুরূপভাবে এই সমস্ত পন্ডিতব্যক্তির গৌড়ে আগমন ও অবস্থিতির ফলে এখানেও সংস্কৃত শিক্ষা ও অন্যান্য বিদ্যাচর্চার ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটে। রাজসভায় নিয়মিতভাবে সংস্কৃত চর্চা ও কাব্যসমালোচনা করা হত। বিভিন্ন রাজ্যের রাজসভাতেও বিদ্যাচর্চা হত, কিন্তু তুলনামূলক ভাবে গৌড় রাজসভায় আলোচিত কাব্য ছিল অত্যন্ত উন্নত শ্রেণীর। আলোচনার ভাষা যেমন ছিল বৈচিত্র্যময় ও আড়ম্বরপূর্ণ তেমনি ছিল তার অলঙ্কার শৈলী। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে -

"৭ম - ৮ম শতকে গৌড়বঙ্গে কাব্যরচনা রীতির প্রকাশ ঘটে - ইহার নাম গৌড়ীয় রীতি। সাধারণত শ্রেষ্ঠ দুইটি রীতিই কাব্যক্ষেত্রে প্রচলিত। বৈদর্ভী ও গৌড়ী। ভামহ-দন্ডী প্রভৃতি গৌড়ী রীতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। দন্ডী যদিও বৈদর্ভী রীতিরই পক্ষপাতী, কিন্তু মানদন্ডের বিচারে গৌড়ীরীতি 'বিপর্য্যয়' লক্ষণাক্রান্ত। তাহার রূপ

প্রধান লক্ষনই হইতেছে 'অর্থডম্বুর' এবং 'অলঙ্কার ডম্বুর', অনুপ্রাস প্রিয়তা এবং বন্ধ গৌরব বা রচনার প্রাচুতা। বৈদর্ভী রীতির প্রধান গুণ ছিল শ্লেষ, প্রসাদ, মাধুর্য, সৌকুমার্য ইত্যাদি।" ১১

ক্রমে গঙ্গা নদী খাৎ পরিবর্তন করে ক্রমাগতভাবে পশ্চিমে সরে যেতে থাকে। ফলে গঙ্গা যতই পশ্চিমে এগিয়ে চলে ততই গঙ্গার তলদেশ থেকে জেগে উঠে বিস্তৃত চড়া। এইভাবে গঙ্গা গতিপথ পরিবর্তন করে বর্তমান ভাগীরথীকে মূলধারা করে সাদুল্লাপুরের পাশ দিয়ে বর্তমান রামকেলীকে বামপার্শ্বে রেখে মহদিপুর হয়ে প্রবাহিত হয়। এইভাবে গঙ্গা সরে যাওয়ায় যে বিস্তীর্ণভূমি জেগে উঠে তাকেও রাজধানীকে গঙ্গার বন্যা থেকে রক্ষা করার জন্য সুদূর অমৃতি থেকে ভাগীরথী (বর্তমান হাড়িগাঁড় গ্রাম) পর্যন্ত একটা বাঁধ এবং অমৃতির নিকট অবস্থিত সোনাতলা গ্রাম থেকে মহানন্দাতীরে অবস্থিত ভোলাহাট (বাংলাদেশ) পর্যন্ত বিস্তৃত বাঁধ তৈরী করা হয়। ভোলাহাট পর্যন্ত বাঁধটি অর্ধচন্দ্রাকার ইঁটের বাঁধ ছিল। এখনও এই সমস্ত বাঁধের ভগ্নাংশ ও ক্ষয়িষ্ণু অংশ দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এই বাঁধগুলি নগরকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করত। কালিন্দ্রীর তীরবর্তী গঙ্গারামপুর (পিছলী গঙ্গারামপুর) থেকে কানসাট (বাংলাদেশ) পর্যন্ত ভাগীরথীর ধার দিয়ে ২৫ মাইল দীর্ঘ একটি বাঁধ নির্মিত হয়েছিল। পূর্বদিকের ২০ মাইল একটি বাঁধ বর্তমানে বাংলাদেশের রোহনপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্বদিকে ভাতিয়ার বিল প্রায় ২৫ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে বিরাট জলাধারে পরিণত হয়েছিল এবং এর জল কখনও শুকাত না। বর্তমানে এই বিলের অধিক অংশ বাংলাদেশে অবস্থিত।

---

১১. রায় নীহাররঞ্জন - বাঙালীর ইতিহাস, ২য়খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্বাক্ষরতা ভবন, ৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯, ১৯৮০, ৩য় সংস্করণ পৃ.৭২৯

"ভাতিয়ার বিলের সৃষ্টির পূর্বে - হিন্দু আমলে তথায় যে লোকের বাস ছিল, তাহার নানা প্রমাণ আছে। হিন্দু রাজত্বকালে ভাতিয়ায় একটি সমাজ গঠিত হয়েছিল। ভাতিয়া নগরে অনেক ব্রাহ্মণদের বাস ছিল।" [১২]

আলোচনার সূত্র ধরে দেখা যায় যে মৈথিলী-সম্প্রদায়ের লোকেরা বল্লালসেনের সময়ে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীতে গৌড়ে এসেছিল ও প্রচুর জমির মালিক হয়ে বসে। গঙ্গা-তীরবর্তী স্থানকেই বসতির জন্য উপযুক্ত মনে করে। ভাতিয়া নগরীর পাশ দিয়ে সেই সময়ে গঙ্গা প্রবাহিত হতে থাকার সময়ে ভাতিয়া নগরীতে প্রচুর ব্রাহ্মণদের বাস ছিল। এদিকে গঙ্গা ক্রমাগতভাবে পশ্চিমদিকে সরে যাওয়ায় রাজধানী [redacted] রমাবতির অর্থাৎ পিছলী গঙ্গারামপুরে অবস্থিত গৌড় রাজধানীর গৌরব লুপ্ত হয়। গৌড়ের রাজধানী রমাবতী ছিল গঙ্গার দক্ষিণ পাশে। কিন্তু গঙ্গার খাত পরিবর্তনের ফলে গৌড় রাজধানীর অবস্থান হয় বাম পাশে। গঙ্গার প্রবাহ বর্তমান রামকেলীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকলে রাজধানীরও পরিবর্তন হয়। রামকেলীর পাশেই বর্তমান (গৌড়ের) রাজধানী নির্মিত হয় ও নূতন ভাবে তাকে সজ্জিত করা হয়। গঙ্গার প্রবাহধারা হাড়িয়াগড়কে বামে রেখে সাদুল্লাপুরের পাশ দিয়ে বর্তমান গৌড়কে বামে রেখে প্রবাহিত হতে থাকে। এই সময়ে গঙ্গার বন্যা রোধের উদ্দেশ্যে অমৃতি থেকে হাড়িয়াগড় পর্য্যন্ত বাঁধ তৈরী হয়ে ছিল। এই বাঁধের অংশ বিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও এর ক্ষয়িষ্ণু অংশ এবং ধ্বংস বিশেষ এখনও প্রাচীন পরিচিতি বহন করে চলেছে। ক্ষয়িষ্ণু বাঁধের উপরে মাণিকপুর, যাদাপুর, হাড়িয়াগড়, ইত্যাদি গ্রামগুলি বর্তমান রয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে মিথিলা থেকে আসা ব্রাহ্মণদেরকে জমি-জায়গা দিয়ে, বৃহত্তম গৌড়ের বিভিন্নস্থানে বসতি দেওয়া হয়। ক্রমে গৌড় বর্তমানস্থানে স্থানান্তরিত হলে, রামকেলী গ্রামের নিকট গঙ্গাতীরে অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করত। বল্লালসেনের

---

১২. চক্রবর্তী রজনীকান্ত, গৌড়ের ইতিহাস, ১ম খন্ড, এ.পি.পাবলিশার্স, ২।৭ এ.সি.মার্কেট, মালদহ, ১৯৮৩, সম্পাদিত সংস্করণ, পৃ.১১২

রাজসভায় অনেক ব্রাহ্মণ পন্ডিত যোগদান করেন এবং বিভিন্নপ্রকার সংস্কৃত কাব্য, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইত্যাদি আলোচনা হতে থাকে। বল্লালসেনের পর তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেন (১১৬৯-১২০৬ খৃঃ) গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। লক্ষ্মণসেন সু-পুরুষ, অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ও সুশাসক ছিলেন। মিথিলা ছিল সমগ্র বাঙলার বিদ্যাশিক্ষার পীঠস্থান। ধ্রুবানন্দ মিশ্র, ভীষ ওঝা, হলায়ুধ মিশ্র (রাজপন্ডিত পরে মন্ত্রী ও বার্ধক্যে ধর্মাধিকারী, বাৎসগোত্রীয় মহাপন্ডিত), পশুপতি মিশ্র, প্রভৃতি পন্ডিত ব্যক্তিরা রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। ইংরেজবাজার শহরের উত্তর প্রান্তে মহানন্দার ধারে ফুলবাড়ি নামক স্থানে বল্লালসেন একটি দুর্গ তৈরী করেছিলেন। এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান রয়েছে। তাছাড়া পুরাতন মালদহের কাছে একডালা নামকস্থানেও একটা দুর্গ ছিল।

মিথিলা থেকে ব্রাহ্মণদের গৌড়ে আগমন ঘটেছিল, সবচাইতে বেশী পরিমানে ১২শ শতাব্দীতে। তাদেরকে মিথিলা ত্যাগ করে বাধ্য হয়েই আসতে হয়েছিল। মিথিলার প্রাচীন নাম ছিল বিদেহ। বিদেহর রাজাদের উপাধি ছিল 'জনক'। সীতার পিতা সীরধ্বজ জনক ছিলেন বিদেহর রাজা। এইজন্য সীতাকে বৈদেহী বলা হয়। এই বিদেহ থেকে সারা উত্তরবঙ্গে আর্য্যোপনিবেশ বিস্তার লাভ করে। মিথিলায় বসবাসকারী ব্রাহ্মণদের অধিকাংশই ছিলেন ধনী ও জমিদার। সুতরাং, এহেন অর্থশালী মিথিলা বিদেশী ধন-লোভী হানাদারদের বারবার আক্রমনে বিব্রত বোধ করে ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। পরে ভারতে মুসলমান অধিকার বিস্তার লাভ করতে থাকলে, মিথিলায় বারবার আক্রমন, লুণ্ঠনরাজ, হত্যা, ইত্যাদি ঘটতে থাকে। ফলে ব্যাপক সংখ্যায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোকেরা মিথিলা ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী ও বৃহত্তম বাংলার ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, গৌড়ে এসে বসবাস শুরু করে। ক্রমে অনেকে আবার ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, ত্যাগ করে মালদহে আগমন করে। এখানে বিভিন্ন প্রকারে প্রচুর পরিমাণ জমি - মায়ুগা পত্তনি নিয়ে অথবা কিনে

বসবাস শুরু করে। সেই সময়ে জমির কোনও নির্দিষ্ট সীমারেখা না থাকায় যে যতদূর পেরেছে, নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী নিজেদের ভোগ দখলে রেখেছিল। এই অঞ্চল পূর্ণিয়া পরগণার অন্তর্গত ছিল। এখনও প্রাচীন দলিল পরীক্ষা করলে, পরগণা পূর্ণিয়া দেখতে পাওয়া যায়। ১২০৩ - ১২০৬ খৃষ্টাব্দে গৌড় সম্পূর্ণরূপে মুসলমান অধিকারে আসে। প্রায় এইরূপ সময়েই এই সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যাপক আগমন ঘটে মালদহে ও বসবাস করতে থাকে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারও অধিক ছিল। মালদহের অনেক স্থানে বিশেষ করে এই সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় টোল বা চতুষ্পাঠী ছিল। কিন্তু মুসলমান রাজত্বকালে তাদের রাজভাষা ছিল আরবী ও ফার্সি। সুতরাং রাজকার্য্যে যোগদানের জন্য এই ভাষাশিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সুতরাং রাজকার্য্যে যোগদানের জন্য রাজভাষা শিক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ফলে ঘরে ঘরে মৌলবী নিয়োগ করে ফার্সি ভাষা শিক্ষার ব্যবকতা দেখা যায়। এদিকে সংস্কৃত শিক্ষার দিকে ঝোঁক কমতে থাকে। আরবী ও ফার্সি ভাষায় শিক্ষালাভ করে অনেকে রাজকীয় কর্মে যোগদান করে। এছাড়া অনেকে বিভিন্ন কৌশলে প্রচুর জমির পত্তনি লাভ করে। অনুসন্ধানে জানা যায় যে - আড়াইডাঙ্গার কুমার পরিবারের প্রথম পুরুষ কাশীনাথ ঠাকুর ও ভোলা নাথ ঠাকুর সুবে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর কাজী ছিলেন এবং পরে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হন। এছাড়া আরও বিভিন্ন গ্রামে বসবাসকারী এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে জানা যায় যে তাঁরা মুসলমান আমলে জায়গীর এবং জমিদারীর স্বত্বও লাভ করেছিলেন। ক্রমে পরিবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সমস্ত অর্জিত সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা হয় এবং ফলে অনেকের সম্পত্তির পরিমান কমে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথমার্ধে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য পতনের সূচনা দেখা দেয়। এই সময় ব্যবসা বাণিজ্যের অজুহাতে বৃটিশেরা ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আসে। অষ্টাদশ

শতাব্দীর মধ্যভাগে বৃটিশেরা তাদের প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নাম ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী রাখে ও ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যের প্রতি লোভী হতে থাকে। এদেশের কিছু লোভী ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদেরকে তাদের অনুগত করে। অনুগতদের দলে পাওয়া যীর-জাফর, জগৎশেঠ, প্রভৃতি লোভী ব্যক্তিদের। এদেরকে প্রথমে সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে ও এদের সাহায্যে চক্রান্ত করে বাংলার সিংহাসন দখল করে। ফলস্বরূপ ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে পলাশীর মাঠে বাংলার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধ হয়। যীরজাফরের চক্রান্তে পলাশীর যুদ্ধে বৃটিশ শক্তি জয়লাভ করে। রাস্তার বাধাস্বরূপ যীরজাফর, জগৎশেঠ, প্রভৃতি ব্যক্তিকে বিভিন্ন অজুহাতে হত্যা করে। এবং বৃটিশরা একের পর এক করে সমগ্র ভারতবর্ষ তাদের অধীনে নিয়ে আসে। মুসলমান শাসনকাল শেষ হয়ে দেশে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব কায়েম হয়। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজপ্রতিনিধি (Commercial Resident) মিঃ থোমাস্ হেন্চ্ম্যান মালদহ শহরে অর্থাৎ ইংরেজ বাজারে একটি দুর্গ নির্মাণ করে। স্বাধীনতার পরে এই দুর্গটিই মালদহ জেলার সদর কার্য্যালয় অর্থাৎ কালেক্টরেট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমানে এরই পাশে নূতন সদর কার্য্যালয়ে ত্রিতল ভবন তৈরী হয়ে সদর কার্য্যালয় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পরিত্যক্ত এই বিশাল ভবনকে পুরাতন কালেক্টরেট হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। এককালের এই পুরাতন ভবনটি বৃটিশ রাজশক্তির দুর্গ ছিল। এই ভবনের অন্ধকারময় ঘরগুলি এদেশীয়দের প্রতি অনেক অত্যাচারের কাহিনী গোপন করে রেখেছে। ফলে বৃটিশ রাজশক্তির অত্যাচারে কলুষিত এই লাল রংয়ের ভবনটি, মনে হয় যেন আমাদের প্রতি এখনও কটাক্ষপাত করে চলেছে। এই দুর্গটি এতই মজবুত ভাবে তৈরী যে এখনও দেখলে নূতন বলেই মনে হয়। শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য বৃটিশেরা ভারতের বুকে সৃষ্টি করে নূতন নূতন জেলা। সমগ্র বাংলাদেশেই ঘটে যায় পরিবর্ত্তনের ছোঁয়া। বেশ কয়েকটি জেলাকে

নিয়ে গঠিত হয় প্রদেশ বা রাজ্য। নবগঠিত রাজ্য বিভাগের ফলস্বরূপ এককালের বঙ্গদেশ মিথিলা বর্ত্তমান বিহারের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন পরগণা পদ্ধতির বিলোপ সাধন ঘটে। সে যায়গায় গঠিত হয় জেলা বা ডিষ্ট্রিক্ট। এই উদ্দেশ্যে বৃটিশ প্রশাসক হ্যামিল্টন্ সাহেবের তত্ত্বাবধানে ১৮০৮ - ০৯ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে পূর্ণিয়া, দিনাজপুর ও রাজসাহী থেকে কিছু কিছু ভূখন্ড গ্রহণ করে গঠিত হয় মালদহ জেলা এবং নিজস্ব শাসন ব্যবস্থার অধীনে মালদহ পুরোপুরি জেলা হিসাবে রূপ লাভ করে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে।

এই আলোচনার কারণ হল - প্রথমে গৌড় ও পরে মালদহের সৃষ্টির পরিচয় দেওয়া এবং মালদহে বসবাসকারী মৈথিল সম্প্রদায়ের পূর্ব বিবরণ দেওয়া ও সেইসঙ্গে বর্ত্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা। ইতিহাসকে বাদ দিয়ে এসমস্ত বিষয় জানবার উপায় নেই। হয়ত বর্ত্তমান প্রজন্মের অনেকেই এই বিষয়ে উদাসীন অথবা অজ্ঞাত রয়েছে। এইভাবে গঠিত মালদহ জেলায় এই সম্প্রদায়ের লোকজন বিভিন্নপ্রকার বৃত্তির উপর নির্ভর করে নিজেদের পালনপোষন করে চলেছে। হিন্দু রাজত্বকালে ব্রাহ্মণেরা যে সমস্ত সম্পত্তির মালীকানা স্বত্ত্ব ভোগ করে এসেছিল, মুসলমানের রাজত্বকালে সেই সম্পত্তির আয়তন কোনও কোনও ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে বই কমেনি। হিন্দু রাজত্বকালে রাজাদের বদান্যতার সুযোগে অনেক মৈথিলী ব্রাহ্মনেরা গৌড়ে এসে বসবাস শুরু করলেও, এই সম্প্রদায়ের ব্যাপকভাবে আগমন ঘটেছে দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই। মিথিলা মুসলমান আক্রমনকারীদের হাতে সব দিক থেকে ব্যাপকভাবে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হয়, দ্বাদশ শতাব্দীতে। ব্যাপক লুণ্ঠতরাজ, নৃশংস হত্যা ইত্যাদি ঘটতে থাকায়, প্রাণের ও মানের ভয়ে এই সম্প্রদায়ের সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত লোকেরা, পার্শ্ববর্ত্তী ভাগলপুর - পূর্ণিয়ায় পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। আবার বৃটিশ রাজত্বকালে যখন বাংলা বিহার প্রভৃতি প্রদেশগত বিভাগ সৃষ্টি হয় তখন আবার বাংলার বাসিন্দা হিসাবে, বিহারকে ত্যাগ করে বাংলার অন্তর্গত মালদহ জেলায় এসে বসবাস শুরু করে এবং পূর্বোক্ত ভাগলপুর - পূর্ণিয়ার

বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করে। অবশ্য অনেকে, যাদের বিশেষ কোন সংস্থান ছিল না বা বারবার স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য যে সমস্ত পরিবার ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম ছিল না, তারা ভাগলপুর - পূর্ণিয়াতেই থেকে গেছে এবং এখনও বসবাস করে রয়েছে। পরবর্ত্তীকালে মালদহে আগত এই সম্প্রদায়ের লোকেরা নূতন নূতন তালুক কিনে অথবা সরকারে নীলাম ডাকে নিজেদের স্বত্ত্বাধীন করে নিয়ে বসবাস করছে। এই সম্প্রদায়ের অনেক ভূস্বামী পরিবারেই এই প্রকারের অধিগৃহীত ভূ-সম্পত্তির কাগজপত্রাদি অর্থাৎ দলিল দস্তাবেজে, এই প্রমাণ পাওয়া গেছে।

"চতুর্দশ শতাব্দীতে ফিরোজশাহের আমলে রাজকর্মচারী ও সেনাপতিরা বংশানুক্রমিক ভোগ দখলের অধিকার সহ প্রচুর কৃষিজমি প্রদান করা হয়েছিল।" [১৩]

এর ফলে সামন্তদের এবং রাজকর্মচারীদের দখলে যে পরিমাণ সম্পত্তি ছিল, সেই সমস্ত সম্পত্তির উপর স্থায়ী স্বত্ত্ব কায়েম বা ধার্য্য করা হল। এই সম্প্রদায়ের অনেক ব্যক্তি সেই সময় বিভিন্ন প্রকার রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিল এবং সুযোগ গ্রহণ করে অনেকেই তালুকের মালিক হয়ে বসল (তালুকের মালিককে তালুকদার বলে)। অনেকে জমিদারী বা জোৎদারীর প্রজাস্বত্ত্ব গ্রহণ করেও ভূস্বামী হয়। বৃটিশ শাসনকালে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে আর্থ অব্ কর্ণওয়ালিশ বড়লাট হয়ে এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি দেশে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' করার জন্য হুকুমনামা জারী করেন। ফলে দেশব্যাপী বিদ্রোহ দেখা দেয়। ভূস্বামীদের বৃহত্তম অংশ মৈথিল সম্প্রদায়ের লোকেরাও এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু বৃটিশ শক্তির অত্যাচারের ফলে নিঃস্ব ও অস্ত্রহীন (বন্দুক - গোলা-বারুদহীন) এদেশীয় জনগণ, কোনও ভাবেই এই নির্মম আইনকে আটকাতে পারে নি। যোজনার পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। অনেক জমিদার পরিবার, অতিরিক্ত বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়েইছিল, আবার এই অতিরিক্ত খাজনার বোঝা

---

১৩. থাপার রোমিলা - ভারতবর্ষের ইতিহাস, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৭, চিত্তরঞ্জন এভি নিউ, কলি-৭২, ১৯৮০, ১ম সংস্করণ, পৃ.২০৮

বহন করা কঠিন হয়ে পড়ল। খাজনা পরিশোধ না করায় তাদের সম্পত্তি সরকারে অধিগ্রহন করে। যে সমস্ত অর্থবান ব্যক্তি এই বর্ধিত হারে খাজনা প্রদান করতে ইচ্ছুক তাদের নামে স্থায়ীপত্তনি দেওয়া হল। এই ভাবে অনেক জমিদার ও ভূস্বামী নিঃস্ব হয়ে পড়ে ও সেই যায়গায় নূতন ভূস্বামী ও জমিদারের আবির্ভাব ঘটে। ইংরেজদের আর্থিক লোভের কথা চিন্তা করে অনেকে অল্প পরিমাণ সম্পত্তি নিজেদের অধিকারে গ্রহণ করে, বাকী অর্থ তেজারতি কারবারে নিয়োজিত করে। কোম্পানির কর্মচারীরা এই সমস্ত তেজারতি কারবারীদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে কোম্পানীর অর্থাভাব ঘটলে ঋণ গ্রহণ করত। তখনও দেশে ব্যাঙ্ক প্রথার বিশেষ প্রচলন ছিল না। এই প্রকার তেজারতি কারবারীরা বৃটিশদের কাছে খুব প্রিয়পাত্র ছিল। আবার অনেকে কোম্পানীর লোকজনদের ঘোসাহেবী করেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কোম্পানীও এই সমস্ত শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি অকৃপন ছিল না। তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার পদবী দানে ভূষিত করেছিল। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বৃটিশের দেওয়া পদবী গ্রহণ করেছিল ও ফলে যাদের মূল উপাধি ছিল ঝা- মিশ্র-ঠাকুর- তাদেরকে যথাক্রমে রায়-চৌধুরী কুমার - উপাধ্যায় - প্রভৃতি নূতন পাওয়া পদবীতে প্রকাশ পেতে দেখা যাচ্ছে। বৃটিশের দেওয়া পদবী অনেক পরিবারই, এখনও বহন করে চলেছে। অনুসন্ধানকালে কিছু পাওয়া পদবীধারীদের সন্ধান পাওয়া এবং তাদের পরিচয় প্রকাশ করিতেছি। কালীয়াচক থানার অন্তর্গত রথবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত রথবাড়ী - গ্রামের অধিবাসী শ্রীকান্ত মিশ্র বৃটিশের দেওয়া পদবী 'রায়' গ্রহণ করে হয়েছিলেন শ্রীকান্ত রায়। এখনও তাঁর উত্তরপুরুষ শ্রীবিধুভূষণ রায় ও তাঁর পুত্রেরা এই 'রায়' উপাধি বহন করেই চলেছে। একইভাবে রামেশ্বরপুরে বসবাসকারী - এই সম্প্রদায়ের শ্রী মনোরঞ্জন বাবুরাও, পাওয়া পদবী রায় ব্যবহার করে আসছিল। বর্তমানে গ্রামের এই সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেকে 'রায়'

উপাধি ত্যাগ করে নিজেদের কৃষ্টীয় পদবী 'মিশ্র' গ্রহণ করেছেন। এছাড়া অন্যান্য গ্রামে পাওয়া পদবীর যা সন্ধান পাওয়া গেছে তা নীচে দেখান হচ্ছে, - যেহুরাপুর - রায় পদবী, বাঙ্গীটোলা - উপাধ্যায় পদবী, শোভানগর ও গৌরিজনা - চৌধুরী পদবী দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য আড়াইডাঙ্গা গ্রামের ঠাকুর রূপান্তরিত হয়ে কুমার এই পদবীকে এই পর্য্যায়ে ফেলা যাচ্ছে না। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের কৃষ্টিয় পদবী ঝা, মিশ্র, প্রভৃতিতে প্রকাশমান। কিন্তু বর্তমানে সমাজের বুকে কিছু বিকারের লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। লেখাপড়া শিখে কিছু কিছু ব্যক্তি নিজেদের কৃষ্টীয় পদবীকে ধরে রাখতে হয়ত লজ্জা পাচ্ছে। কারণ ঝা বা মিশ্র পদবী বর্ত্তমান প্রজন্মের বাঙ্গালীদের কাছে বিহারী বলেই ঘৃণিত। এরা বাঙ্গালী সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্যই পদবী পরিবর্ত্তন করছে। যেমন কালিয়াচক থানার অন্তর্গত দুর্লভপুর গ্রামের অধিবাসী শ্রী বিনোদবিহারী মিশ্রর দুই পুত্র নিজেদের চক্র-বর্তী পদবী গ্রহণ করেছেন কিন্তু এঁদেরই এক ভাই শ্রী নিধিরঞ্জন মিশ্র নিজেদের কৃষ্টিয় পদবীতেই বিরাজ করছেন। অবশ্য যাঁর মিশ্র উপাধি তিনি সুগ্রামেই বসবাস করছেন, আর যে দুই ভাই চক্র-বর্ত্তী উপাধি গ্রহণ করেছেন তাঁদের একজন কলকাতা ও একজন মালদহ শহরে বাসস্থান তৈরী করে বসবাস করছেন।

এই সম্প্রদায়ের লোকজন মিথিলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে মালদহে এসে বসবাস করছে। ফলে তাদের প্রাচীন ও পারিবারিক পরিচয় জানতে প্রথমে জানতে হবে, তারা কোন গ্রাম থেকে এসেছে। কারণ বর্ত্তমান প্রজন্মের অনেকেই জানে না তাদের অতীত বাসস্থান কোথায় ছিল। সুতরাং এই অতীত বাসস্থান বা গ্রাম জানতে হলে তাদের মূল জানতে হবে। কারণ এই মূলের মধ্যেই গ্রাম লুকিয়ে আছে। আগত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় যে একই পরিবারভুক্ত ছিল বা ছিল না, এটা জানার জন্য গোত্র বিচারের প্রয়োজন।

সাধারণত: মিথিলায় বসবাসকালে একেক গোত্রীয়ভুক্ত লোকদের নিবাস একেক গ্রামে। এখনও মিথিলায় এইভাবেই বিচার হয় এবং গোত্র অনুসারেই গ্রামের বা মূলের পরিচয় নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এখনও মিথিলায় অথবা মিথিলা থেকে (কোনও কারণে নবাগত) আসা কোনও ব্রাহ্মণ অন্যের পরিচয় জানার জন্য জিজ্ঞাসা করে - 'কি মূল ছিয়ই' - মূল কি ? কারণ এই মূল ধরেই তারা গোত্র সম্বন্ধে এবং ব্রাহ্মণের সাম্প্রদায়িক মর্য্যাদা সম্বন্ধে স্থির করে। এই কারণেই নীচে কয়েকটা গ্রাম ও তার মূল সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা হচ্ছে। যেমন -

	গ্রাম	মূল		গ্রাম	মূল
১।	পিনোহর	সুরগণ	১০।	বুধবার	মহিষী
২।	রাজেনপুর	দরিয়ার.	১১।	মওয়র	সিং সিলবাড়
৩।	রাতৌন	ঐ	১২।	ঐ	আহির
৪।	শোরাইয়া	উনেবার	১৩।	পদমপুর	পক্কোৎ
৫।	সদরপুর	রোঢ়া	১৪।	হরিহরপুর	বলিরাজপুর
৬।	একহর	আসি	১৫।	সরিসন	ছাগন
৭।	ঐ	বিচৌল	১৬।	সদরপুর	রহরিয়া
৮।	ঐ	কনৌল			
৯।	নোয়া	সুরগণ			

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে দীর্ঘসময় ধরে মিথিলা থেকে, মৈথিলী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের আগমন ঘটেছে - সন্দেহে। কিন্তু প্রথমে কারা এসেছিল ও কোথায় বসবাস করছিল , এই সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে, তা নীচে দেখান হচ্ছে, -

"টাঙ্গুঁ যাঙ্গুঁ টাঁর মহেষ
রাজমহল গোবিন্দ দরবেশ।
ঘর চার বৈঠে মকড়াই
বাঙ্গীটোল মধুরায় গোঁসাই।" [১৪]

অনেক অনুসন্ধান করেও টাঙ্গুঁ-যাঙ্গুঁ সম্বন্ধে প্রকৃতভাবে কিছু জানতে পারা যাচ্ছে না। এদের সম্বন্ধে কোনও প্রকার লিখিত তথ্যও পাওয়া যায় নি। তবে টাঁর বলে চিহ্নিত জায়গাটার অস্তিত্ব বর্ত্তমান রয়েছে এবং এখানে এককালে জনবসতি ছিল তার প্রমাণ চিহ্ন হিসাবে পরিত্যক্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত বাস্তু জমির অস্তিত্ব এখনও রয়েছে। শিবনারায়নপুর ও বালুচর (দুর্লভপুর) এবং মাঝখানের স্থানকেই এককালে 'টাঁর' বলা হত। এখন সেইস্থানে বটগাছ, আমলকীগাছ ও শেওড়াগাছ দেখা যায়। বটগাছের নীচে একটা মন্দিরহীন কালীদেবীর বেদী রয়েছে ও প্রতি বৎসর দেওয়ালীতে কালীপূজা হয়। স্থান ত্যাগী পরিবারজন বর্ত্তমানে শিবনারায়নপুর ও বালুচর গ্রামে বসবাস করছে। গোবিন্দ নামের ব্যক্তি রাজমহলে এসে বসবাস করে। দরবেশ কথাটার অর্থ হল ফকির বা ভবঘুরে, প্রকারান্তরে সন্ন্যাসী। রাজমহলের অনতিদূরে উদুয়া নামক স্থানে কয়েকঘর মৈথিলী ব্রাহ্মণ পরিবার এখনও বসবাস করছে। এই উদুয়াকেই ইতিহাসের বিখ্যাত উদয়নালা নামে পরিচিতি রয়েছে। মকরাই মৌজা বলতে বুঝায় - একবর্ণা, সিমলা, গোবরজনা, আড়াই-ডাঙ্গা, ইত্যাদি গ্রাম অধ্যুষিত এলাকাকে। চারঘর ব্রাহ্মণ পরিবার এই মৌজাতে এসে বসবাস শুরু করেছিল, কিন্তু কে কোথায় বসতি স্থাপন করে সম্বন্ধে কোনও তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে উল্লিখিত চারিটি গ্রামই ব্রাহ্মণ প্রধান।

ঝা অধীরচন্দ্র - হাতে লেখা কিছু কাগজ ও খাতার মধ্যে লিখিত তথ্য পেয়েছি। ইনি - বাঙ্গীটোলা নিবাসী। তাঁর কাছে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যেই এটা রয়েছে।

বাঙ্গীটোলা গ্রামে বসতি স্থাপন করে মধুরাম গোঁসাই। এই পরিবারের বংশ ধারা এখনও এই গ্রামে বর্ত্তমান রয়েছে। প্রকৃত বৃত্তান্ত জানতে পারি - তা হল, স্থানটি এককালে শ্মশান ছিল। গঙ্গা নদী এই স্থান দিয়ে প্রবাহিত হত। গঙ্গাতীরে শ্মশানঘাট। শ্মশানের দেবীর নাম মুণ্ডকেশীদেবী। শ্মশান বলেই এখানে বসবাস ছিল ডোম ও চণ্ডাল জাতীয় কয়েক ঘর পরিবারের। এরা সমাজের অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর অধিবাসী এবং এরা মদ, গাঁজা, ভাঙ্গ সেবন করত (খেত), নেশায় মত্ত হয়ে থাকত। বন্যার পরে, গঙ্গার পারে প্রচুর পলি যুক্ত বালুকাময় ভূমিতে 'বাঙ্গী' নামক একপ্রকার রসাল ফলের চাষ ছিল ব্যাপকভাবে। ভদ্রলোকদের কোনও বসতি ছিল না। এর কিছুকাল পরে মায়েরভক্ত ও সাধক বলে প্রসিদ্ধ রামদেব চক্রবর্ত্তী জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ) থেকে এই শ্মশানে এসে মুণ্ডকেশী মায়ের সেবা ও সাধনা করতে থাকেন। এর পরেই এই গ্রামে একজন ব্রাহ্মন - মধুরাম মিশ্র এসে বসতি স্থাপন করেন। আরও কয়েকঘর বসতি স্থাপিত হলে সেহ বসতিহীন স্থান একটা পাড়ায় পরিণত হয়। এই পাড়াকে 'টোলা' বলে। এদিকে প্রচুর পরিমানে বাঙ্গী উৎপাদন ক্ষেত্রে যে পাড়া বা টোলার উৎপত্তি হল, তারই নামকরণ করা হল বাঙ্গীটোলা। পরাশর গোত্রীয় মধুরাম মিশ্রের বংশধারা, এখনও এই গ্রামে বসবাস করছে (কুলপঞ্জী নীচে [redacted] দ্রষ্টব্য)। বর্ত্তমানে মুণ্ডকেশীর দেবীস্থানে একটা পাকা মন্দির ঘর তৈরী করে গ্রামের অধিবাসীরা একসঙ্গে মিলে, মহাধুমধামের সঙ্গে দেবীর পূজা করে থাকে। এই ধারা গত ১৪ বৎসরকাল চলে আছে। এই উদ্দেশ্যে ধর্মীয় পুস্তক পাঠ, কীর্ত্তন, ভজন, প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়। ভক্ত ও সাধক রামদেব চক্রবর্ত্তীর বংশ পরিচয় দেওয়া হল। -

রামদেব চক্রবর্ত্তী
|
দয়ারাম
|
রামানন্দ
|
কাশীনাথ
|
রামজয়
|
গয়ানাথ — কৃষ্ণধন — রামেশ্বর

গয়ানাথের বংশধারা সম্মুখে কিছু জানতে পারা যাচ্ছে না। কিন্তু কৃষ্ণধন ও রায়েশ্বরের বংশধারা এখনও এই গ্রামে বসবাস করছে।

হাড়িয়াগড় গ্রাম সম্মুখে কিছু বলতে গেলে, প্রথমেই বলতে হয় যে - এই লেখকের পূর্বপুরুষ শ্রী জয়নারায়ন মিশ্র সপ্তদশ - অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে এখানকার জোৎদারী স্বত্বের অধিকারী ছিলেন। (কুলপঞ্জী অংশে এই বংশের ধারাবাহিকতা দেখান হচ্ছে।) চাঁচোলের রাজা ও রাজবনেলীর রাজার নিকট থেকেই জোৎদারী স্বত্ব পেয়েছিলেন। এই গ্রামেই একজন জমিদারের বাস। চাঁচোল রাজার অধীনের এই জমিদারের নাম ছিল কেবলচন্দ্র ঝা। এঁর পূর্ব পুরুষ শ্রীভাঁস ঝা জমিদারীর পত্তন করেন। বর্তমানে আর জোৎদারীও নেই জমিদারীও নেই। শ্রীভাঁস ঝার উত্তরপুরুষ কালীপদ ঝা ও আরও দুই ভাই এই গ্রামেই বসবাস করছে। শোভানগর গ্রামের শ্রী প্রবোধ ঝা এবং কালিন্দ্রী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী পিনাকী ঝা মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের বংশ পরিচয় (কুলপঞ্জী অংশে দ্রষ্টব্য) জানতে পারি যে, এই শোভানগর গ্রামটি গঙ্গার তলদেশ থেকে জেগে উঠা ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ কিছুদিন আগেও একটা বাড়ীর খনন কার্য্যের সময় মাটীর নীচ থেকে একটি বড় নৌকার গলুই পাওয়া যায়। তাছাড়া এই বংশে অনেক কৃতী সন্তানদের সন্ধান পাওয়া যায়। বংশলতিকা অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে এই বংশের প্রথমপুরুষ বিশ্বম্ভর ঝা সপ্তদশ শতাব্দীতে মালদহে এসে বসবাস শুরু করেন, সুনামধন্য স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ এই বংশের সপ্তম পুরুষ (১৮৮১ - ১৯৭৭ খৃ:) ১০৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। বিদ্যালয় বিভাগে পরিদর্শক পদে কার্য্যভার গ্রহন করেন ১৯৩৯ খৃ:। ক্রমান্বয়ে তাঁর চাকুরীতে পদোন্নতি ঘটে ও শেষ সময়ে তিনি জেলা পরিদর্শক অবস্থায় চাকুরী থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে বাংলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেন, যেমন - মালদহ, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, গাইবাঁধা, রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া, বহরমপুর ও দিনাজপুর, প্রভৃতি। সুদীর্ঘকাল (১৯৩৯ - ১৯৭৭ খৃ:) বৃত্তি উপভোগ করে তিনি দেহত্যাগ করেন।

আড়াইডাঙ্গাঁ গ্রামটি প্রথমে কালিন্দ্রী-নদীর অপর পারে গৌড়ীপুর নামক স্থানে ছিল। নদীর করাল গ্রাসে এই বাসস্থান ত্যাগ করে বর্ত্তমান আড়াইডাঙ্গাঁ গ্রামটি অবস্থিত রয়েছে। আড়াইডাঙ্গাঁ নামটির নিশ্চয়ই কিছু পশ্চাৎপট্ রয়েছে। প্রাচীনকালে সাধারণত ভৌগোলিক অবস্থান উপলক্ষ করেই যায়গার নাম রাখা হত। যেমন হাড়িয়াগড়, বাঙ্গীটোলা, ইত্যাদি। হয়তঃ যখন এই গ্রাম প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়,সেই সময়ে ভূমির অবস্থান ছিল বিচিত্র রকমের। দুইটা বড় টিলা ও একটি ছোট টিলা। গাণিতিক নিয়মে এটাকে আড়াই বলা হয় এবং এলাকাটা ডাঙ্গাঁ অর্থাৎ উঁচু ছিল বলেই সব মিলিয়ে আড়াইডাঙ্গাঁ এই নামকরণ করা হয়েছে। আমার দেওয়া এই তথ্য কতদূর সত্য বলা মুস্কিল, তবে বোধ হয় হিসাবে বিশেষ তফাৎ হবে না। আড়াইডাঙ্গাঁ এই সম্প্রদায় অধ্যুষিত বৃহত্তম গ্রাম। গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় একই বংশধারার নয়। বিভিন্ন বংশধারার সমন্বয়ে গ্রামটির উৎপত্তি হলেও সকলে একটা বিশিষ্ট সমাজ ব্যবস্থাকে এমনভাবে গ্রহণ করেছে যে - বাহ্যিক ভাবে কোনও বিভেদ দৃষ্টিগোচর হয় না। গ্রামের মধ্যে উদ্ভূত যে কোনও সমস্যার সমাধান নিজস্ব সালিশীতে নিষ্পত্তি করা হয় এবং প্রত্যেকে এই সালিশীর মাণ্যতাও দিয়ে আসছে। বংশধারা বিচারে কাশীনাথ ও ভোলানাথ ঠাকুরের উত্তরপুরুষেরাই এই গ্রামের বৃহত্তম বংশ। অনুসন্ধানে আরও জানা যায় যে এই বংশধারা মিথিলার মধুবনী(উনেবারুনী) সন্তোষ ঠাকুরের বিধবা পত্নী দুটি নাবালক পুত্র সঙ্গে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এখানে এসে, স্থানীয় গোয়ালাদের সাহায্যে এই গ্রামে অর্থাৎ প্রথমে গৌড়ীপুরে ও পরে এই সম্প্রদায় আড়াইডাঙ্গাঁ গ্রামে বসবাস করছে। সংস্কার বশতঃ সংস্কৃত শিক্ষা ও কর্মের উদ্দেশ্যে ফার্সী ভাষায় জ্ঞানলাভ করে, বাংলার নবাব সরফরাজ খাঁর কাজী হিসাবে নিযুক্ত হন। পরে মুর্শিদকুলী খাঁর (১৭৫০ খৃঃ) কাজী হিসাবেই কাজ করেন। নবাবের উদারতায় এই সময়ে তিনি প্রচুর ভূসম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হন।

ক্রমে এই পরিবার বৃদ্ধি পাওয়ায়, কতক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে বিভক্ত হয়, এই সঙ্গে ভূসম্পত্তিরও ভাগ-বাটোয়ারা হয়। এইরূপ ভাগ-বাটোয়ারার প্রভাব এত ব্যাপক হলযে অনেক পরিবারের ভাগ্যে নিজস্ব জমির সংখ্যা অত্যন্ত কম। অবশ্য এরই মধ্যে কিছু পরিবার নিজের চেষ্টায় সম্পত্তির পরিমান বাড়িয়েছে। এই বংশধারার বর্ত্তমান উত্তর পুরুষ শ্রী হৃদয়কুমার আমার আত্মীয় ও বিদ্যালয়ে আমাদের অংকের শিক্ষক মহাশয়। তাঁর পুত্র শ্রীমান অরুণের কাছে এই বংশের কুলপঞ্জী দেখতে ও লিপিবদ্ধ করার সুযোগ লাভ করেছি(কুলপঞ্জী অংশ দ্রষ্টব্য)। এই বংশের আর এক উত্তর পুরুষ শ্রী নিখিল কুমারের সঙ্গে আলোচনায় উপরোক্ত তথ্যের স্বীকৃতি লাভ করেছি। এছাড়া গ্রামের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনায় এই তথ্যের স্বীকৃতি পেয়েছি। আড়াইডাঙ্গা গ্রামের পাশেই ইতিহাস পুরুষ 'ভবানী ঠাকুরের' প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির রয়েছে। কালিন্দ্রী নদীর তীরে গ্রাম্য শ্মশানের এই কালীমন্দিরটি 'গোবরজনার কালী' বলেই মালদহে বিশেষভাবে প্রচারিত ও পরিচিত। প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসে দেওয়ালীর দিন ৺কালীমাতার মূর্ত্তি তৈরী করে সাড়ম্বরে পূজানুষ্ঠান হয়। এই মন্দিরে কালীপূজার রাত্রে থেকে পরদিন পর্য্যন্ত অন্তত ৭০০ - ৮০০ শত পাঁঠা বলি করা হয়, কোনও বৎসর মহিষ বলিও করা হয়। কালীপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহুলোকের সমাগম হয় এবং কয়েকদিন ধরে মেলাও চলে। কালীমন্দিরের পাশেই 'ঘন্টিবাবা' নামে বিখ্যাত একজন সাধক শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করে যায়গাটার মাহাত্ম্য আরও বাড়িয়েছেন। আড়াইডাঙ্গা গ্রামটি শিক্ষায় অন্যান্য মৈথিলী প্রধান গ্রাম অপেক্ষা অনেক এগিয়ে আছে। মালদহের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে সড়ক পথে যোগাযোগের সুব্যবস্থা রয়েছে। এই স্থানে পূর্বে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোল বা চতুষ্পাঠী ছিল, বর্ত্তমানে নদীর করাল গ্রাসে চতুষ্পাঠীটি নদীগর্ভে নিমজ্জিত। নূতনভাবে টোলের প্রতিষ্ঠা করার উদ্যম বর্ত্তমানে পরিলক্ষিত হয় না। এই টোল বা

এই টোল বা চতুষ্পাঠী মৈথিল সম্প্রদায়ের একটা ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তাকে আজ এই সম্প্রদায় অবহেলা ভরে ত্যাগ করেছে।

মাণিকচক থানার চৌকীগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে দেখা যায় যে - নবাবী আমলে এখানে নবাবের কিছু সৈন্যসামন্ত অবস্থান করত। রাজমহল হয়ে কোন শত্রুসৈন্যের গতি রোধ করা ও স্থানীয় সায়ত্বশাসন তদারকি করার জন্যই এই পুলিশ থানার অবস্থান ছিল। থানাকে কোতুয়ালী ও ছোট নজরদারী পুলিশ থানাকে চৌকী বলা হত। এই হিসাবেই চৌকী গ্রামের সৃষ্টি। যে সমস্ত নবাবী সৈন্যরা অর্থাৎ মুসলমান সৈন্যরা এখানে কর্মরত ছিল তারা পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী গ্রাম এনায়েতপুরে বংশ বিস্তার করে বসবাস করছে। এই চৌকীতে বা চৌকী গ্রামে সুনামধন্য ব্যক্তি শ্রী বিশেশ্বর ঝা মহাশয়ের জমিদারীর ছিল। তাঁর একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতে নিজের দৌহিত্র বা নাতি গয়ানাথ ঝাকে দ্বারভাঙ্গা জেলার মধুবনী থেকে নিয়ে আসেন ও জমিদারী তাঁর হাতে সমর্পণ করেন। গয়ানাথ ঝা মালদহে আসার আগে নিজের পিতার সঙ্গে বোধগাঁ ও পরে আরারিয়াতে বাস করতেন। আরারিয়াতে এখনও তাদের বাস্তুজমি রয়েছে। বাস্তুজমির নাম পরশমণ ভিটা। গয়ানাথ ঝার পুত্র কুমুদানন্দ ঝা এই বংশের দ্বিতীয় পুরুষ। অল্পদিন হল তিনি দেহরক্ষা করেছেন। কুমুদানন্দ ঝার চারিটি পুত্র - অজিৎ, সঞ্জিৎ, রঞ্জিৎ ও শ্যামল বর্তমান রয়েছে। অজিৎ ঝার সাহায্যে কুমুদাবাবুর বড় মেয়ে - বাগীটোলা নিবাসী হৃষিকেশ মিশ্রর বিধবা পত্নী মনোরমা দেবী, বয়স ১০৪ বৎসর, তাঁর ছোট ছেলে মিহির (দুলু) মিশ্রর সিংহাতলার বাস ভবনে সমর্থনপুষ্ট উপরের তথ্যগুলি লাভ করি। হৃষিকেশ মিশ্রর ছেলেদের নাম - শ্রীপতি রমাপতি, ভবপতি, সুধাংশু ও মিহির। এর মধ্যে সুধাংশু ও মিহির ভক্তশ্রেণীভুক্ত ও মালদহ জেলায় বিশেষ পরিচিতি রয়েছে।

রত্নুয়া থানার অন্তর্গত অবস্থিত একবর্ণা গ্রাম বিভিন্ন কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথিত মকরাই মৌজায় এই গ্রামটির অবস্থান। মালদহ থেকে মাদিয়া ঘাট হয়ে পাকা সড়কে এই গ্রামের যোগাযোগ এবং উক্ত পাকা সড়কটি রত্নুয়া হয়ে চাঁচোল এবং ভালুকা হয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর যাওয়া যায়। মাদিয়া ঘাট থেকে মাত্র তিন কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত এই গ্রামে স্বর্গীয় লক্ষ্মীকান্ত মিশ্র একজন সম্পন্ন ভূস্বামী ছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁর পুত্রদের ও পরে দৌহিত্রদের মধ্যে জমির ভাগ বাটোয়ারা হয়ে, প্রত্যেকের ভাগে সম্পত্তির পরিমান সিমীত সীমায় পৌঁছেছে। লেখকের মাতুলালয় একবর্ণা গ্রামে অবস্থিত। দাদুর নাম কুঞ্জলাল মিশ্র। মাতুলদের নাম - নিশিকান্ত, মৃণাল, অসিৎ ও রামকৃষ্ণ সপরিবারে ও সুচ্ছন্দে এখানে বসবাস করছেন। চারিভাই স্কুলের শিক্ষকতা করে দিনাতিপাত করে চলেছে। ভূমি সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখযোগ্য নয়। এই গ্রামের বাসিন্দা বর্ত্তমানে মৃত শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন মিশ্র (রাধা মাষ্টার) এঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি অত্যন্ত অধ্যবসায়ী ও উদযোগী পুরুষ ছিলেন। গ্রামে বসবাসকারী এই সম্প্রদায়ের লোকজন অত্যন্ত পরিশ্রমী, কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠ ও স্বাবলম্বী। চাষের ব্যাপারে তাদের নিজস্ব দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। শিক্ষার দিক দিয়েও এই গ্রাম এগিয়ে চলেছে। গ্রামে অবস্থানকারী প্রায় প্রত্যেক পরিবার বর্ত্তমানে স্বাবলম্বী। এই গ্রামেরই আর এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র পরম পূজনীয় স্বামী গদাধর(রমণী) মহারাজের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাল্যজীবন থেকেই তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটে ও যৌবনে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত জয়রামবাটী-কুয়ালপাড়া আশ্রমটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আশ্রমে দেবী সিংহবাহিনীর মন্দির রয়েছে। স্বামীজির কৃপাধন্য অনেকেই এখনও তাঁর নাম স্মরণে রেখেছে।

খরবা (চাঁচোল) থানার অন্তর্গত ডুমরো গ্রাম সম্বন্ধে কিছু বিবরণ উদ্ধৃত করছি। এককালে কাপাসিয়া - তুঁতবাড়ি রেশম উৎপাদনে মালদহে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই গ্রামগুলির উন্নত ধরনের রেশম তদানীন্তন গৌড়ের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য ছিল। এই স্থানের রেশম চীন, গ্রীস, প্রভৃতি দেশে রপ্তানী করা হত। পৌন্ড্র ও পরে গৌড় রাজত্বকালে এই শিল্পের রপ্তানী বাজার ছিল রমরমা। কাপাসিয়ার পার্শ্ববর্তী গ্রাম বা আর একটা পাড়ার নাম ডুমরো। এককথায় ডুমরো কাপাসিয়া বললে সকলেই জানে।[১৫]

দ্বারভাঙ্গা জেলার ফুলুয়া নায়ক গ্রাম থেকে বিচক্ষুবৃদ্ধি গোত্রীয় মৈথিলী ব্রাহ্মণ শ্রী গোলকনাথ মিশ্র মহাশয় আনুমানিক সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে প্রথমে মালদহ জেলার কাহালা নায়ক গ্রামে আসেন। পরে প্রচুর ভূসম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হয়ে ডুমরো নায়ক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ক্রমান্বয়ে এখানকার জমিদার হয়ে বসেন। তাঁর রাজবাড়ীর কাঠামোয় নির্মিত বাড়ী, যা এখনও অটুট অবস্থায় বর্ত্তমান রয়েছে, প্রমাণ করে যে তাঁর জমিদারীর বার্ষিক আয়ের পরিমান নিতান্ত কম ছিল না। তাঁর অধীনে হাতী, ঘোড়া, লোকজনের উপস্থিতি ছিল রাজকীয়। চাঁচোল রাজার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই বংশধারার কুলপঞ্জী নীচে দেখান হল। -

মূল - ফুলুয়া(দ্বারভাঙ্গা)   বিষ্ণুবৃদ্ধি গোত্র

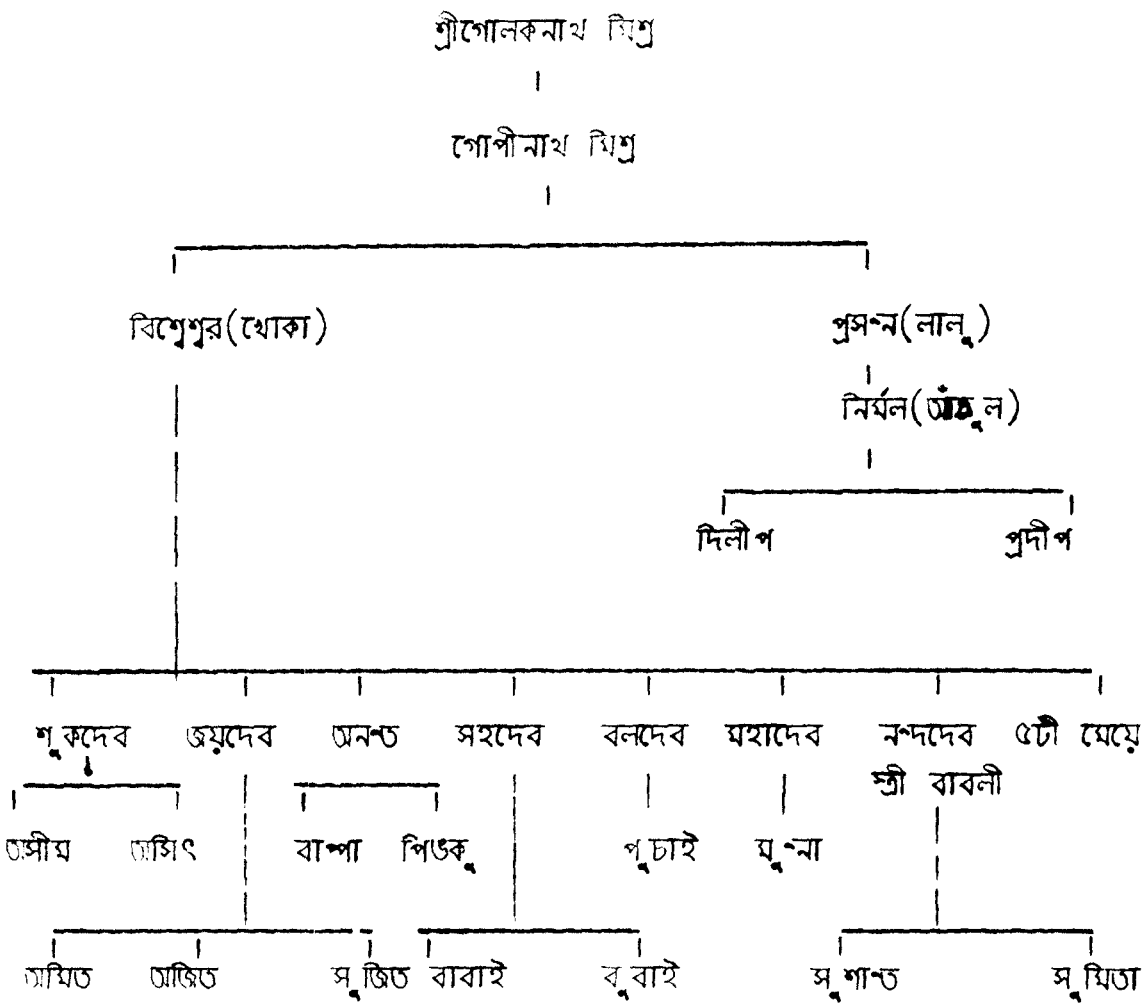

গোলকনাথ মিশ্র জমিদারী সূত্রের অধিকারী হয়ে চাঁচোলের প্রায় পার্শ্ববর্তী ভুমরোতে বসতি স্থাপন করার পরে, উক্ত চাঁচোল রাজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মে ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। আ-মরণ এই বন্ধুত্ব অটুট থাকে। ১৯৬২ খৃঃ জমিদারী স্বত্তলোপ আইনের বলে, সরকারী নিয়মে ধার্য্য জমির পরিমান বাদে বাকী সমস্ত সম্পত্তি সরকার

বাজেয়াপ্ত করে। যা থাকে তা আবার বংশানুক্রমে ভাগ বাটোয়ারার দরুণ বর্তমানে শুকদেব মিশ্রের মাথাপিছু জমির হিসাব অত্যন্ত কমে যায়। নির্মলের অবিভক্ত সম্পত্তির পরিমান অনেক। বর্তমানে বিশেষ করে বিশ্বেশ্বর মিশ্রের সন্তানেরা, সম্পত্তির আয়ের উপর নির্ভরশীল না হয়ে বিভিন্ন সংস্থায় চাকুরী করে নিজেদের স্বাচ্ছল্য বজায় রেখেছে। অন্যান্য ভাইয়েরা ব্যবসার দ্বারা অর্থ উপার্জন করছে। এই ধারার অর্থাৎ বিশ্বেশ্বর মিশ্রের কনিষ্ঠতম পুত্র নন্দবেদ মিশ্র লেখকের জামাই; কোনও চাকুরী না করেও ব্যবসা ও কৃষির উপর নির্ভরশীল।

মালদহ জেলার মৈথিলী সম্প্রদায় অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামে সমীক্ষা করে জানতে পারা যাচ্ছে যে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা একমাত্র যজন-যাজন বৃত্তির উপর নির্ভরশীল নয় এবং শুধু এই বৃত্তির উপর নির্ভর করেই মালদহে বা গৌড়ে আসেনি। আবার বর্তমানে, মালদহে এই সম্প্রদায়ের যে সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে তারা সকলেই শুধুমাত্র মিথিলা থেকে আসে নি। প্রামাণিক তথ্যের উপর নির্ভর করে বলা যায় যে এই সম্প্রদায়ের লোকেদের ব্যাপকভাবে মিথিলা ত্যাগ ঘটেছে সপ্তদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সম্প্রদায় অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে সমীক্ষা চালিয়ে ও বিভিন্ন পরিবারের বংশ পঞ্জি অনুসরণ করে দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে যে জনসংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে তা গ্রামভিত্তিক একেরই বহু (বংশের) বিস্তার। একথার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি বংশের কুলজী বা বংশলতিকা (কুলজী অংশে) দেখান হচ্ছে। আরও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে প্রাথমিক স্তরে যে সমস্ত মৈথিলী সম্প্রদায়ের লোকজন এখানে এসেছিল ও বিভিন্ন গ্রামে বংশবিস্তারে বসবাস করে চলেছে তাদের অনেকেই জমিদার - জোৎদার - ভূস্বামী ছিল। অবশ্য দ্বারভাঙ্গা জেলায় বসবাস করার সময়ও এরা বেশ ধনী ছিল। দ্বারভাঙ্গায় বসবাসকারী ব্রাহ্মণেরা বিশিষ্ট ধনী ছিল বলেই

বিভিন্ন সময়ে এই শ্রেণীর উপরে পার্বত্য জাতিরা বারবার হানা দিয়ে লুঠ করে নিয়ে যেত। মুসলমান রাজত্বকালে লুঠপাটের ও নানারকম অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপনের জন্য নিরাপদ স্থান হিসাবে পার্শ্ববর্তী জেলা পূর্ণিয়ায় চলে আসে। পূর্ণিয়ার এই অংশ পরে (১৮০৮) খৃষ্টাব্দে) মালদহ জেলা সৃষ্টির জন্য পূর্ণিয়া থেকে কেটে মালদহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বর্তমান মালদহের অধিক সংখ্যক মৈথিলী অধ্যুষিত এলাকাগুলি তৎকালীন পূর্ণিয়ার অন্তর্গত ছিল। এই জেলা সৃষ্টির ইতিহাস সাক্ষী রেখে একথা স্বীকার করতেই হবে। আবার পূর্ণিয়া গৌড় সুবার অর্থাৎ বাংলার সুবার অন্তর্গত ছিল। প্রামানিক তথ্য অনুসারে দেখা যায় যে দ্বারভাঙ্গা থেকে মালদহে যে সমস্ত মৈথিলীরা এসেছিল ও এখানে এসে জমিদার-জোৎদার-ভূস্বামী হয়ে বসবাস করছে, তারা দ্বারভাঙ্গাতেও ধনী ও অভিজাত ব্যক্তি ছিল। এই ধরনের ধনাঢ্য বা অভিজাতদের কিছু পার্শ্বচর অথবা মোসাহেব থাকে এবং এই সম্প্রদায়ের লোকেদেরও তাই ছিল। এদের দেশ ত্যাগ করে মালদহে বসতি স্থাপনের সংবাদে পূর্বোক্ত পার্শ্বচর বা মোসাহেবরা মালদহে আসে ও নিজের নিজের প্রভুর বদান্যতায় এখানে বসবাস করছে। ফলে এই প্রকারে অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করে এসে এখানে বসবাস করছে ও এই সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মূল শিক্ষার যে ধারা তা ছিল সংস্কৃত। মালদহে এসে তারা বিভিন্ন ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত গ্রামে টোল বা চতুষ্পাঠী স্থাপন করে, সংস্কৃত ব্যাকরণ, ন্যায়, স্মৃতিশাস্ত্র, বেদ, ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হত। তখনকার সময়ে এই সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরা বিভিন্ন প্রকার বৈদিক ক্রিয়াকর্ম ও পুরোহিত বৃত্তিতে নিয়োজিত হয়ে নিজেদের অর্থসংকট দূরীভূত করে। পুরোহিত বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণেরা মালদহে বিভিন্ন সম্প্রদায় (হিন্দু সম্প্রদায়) অধ্যুষিত গ্রামে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। এদেশীয়

জনগণের মনে ব্রাহ্মণ প্রীতি জেগে উঠে। পুরোহিত বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণদেরকে তারা গুরুর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করতে শুরু করে। চতুর পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা বেশ কয়েকটি গ্রামকে। নিজের যজমানী এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসে। এলাকাভুক্ত অধিবাসীদের আখ্যা দেওয়া হয় যজমান এবং পুরোহিতকে এই সমস্ত যজমানেরা আখ্যাদেয় ব্রাহ্মণ ঠাকুর বা ঠাকুর বলে। ফলে ঠাকুরদের বিচারে তার অধিগত এলাকা তালুক হিসাবে পরিগণিত হয়। এই তালুকে উক্ত পুরোহিত অলিখিত তালুকদার এবং অন্য কোনও পুরোহিত ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করতে পারে না বা এই অঞ্চলের কোনও রূপ ক্রিয়াকর্ম পরিচালনা করতে পারে না। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পুরোহিতদের সঙ্গে এই প্রকারের তালুক ভাগ ব্যাপারে একটা অলিখিত চুক্তি সম্পাদন করে পরম স্বচ্ছলতার সঙ্গে কালযাপন করতে থাকে। অনেকে আবার সুযোগের সাহায্যে কিছু ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে উঠে। আরও একটা বিষয়, বিশেষভাবে লক্ষ্য গোচর হয় যে এই সমস্ত পুরোহিতদের উপস্থিতি না হলে কোন গ্রামেই কোনও প্রকার ক্রিয়া কর্মের অনুষ্ঠান ঘটে না। নেপথ্যে এর একটা লোভণীয় উদ্দেশ্য হল - যে কোনও ক্রিয়া কর্মের ফর্দ মানা এই ধরণের পুরোহিত সাধারণতঃ নিজেদের আয়ের পথ সুগম করার জন্য কিছু অপ্রয়োজনীয় জিনিষের অনুপ্রবেশ ঘটাত। যেমন চাল-ডাল-কাপড়-নগদ দক্ষিণা ইত্যাদির প্রাপ্তির ব্যাপারে পুরোহিতেরা খুব সজাগ ছিল। ফর্দমালা তৈরী করার সময় তারা যজমানের আর্থিক পরিস্থিতির দিকে কিছুমাত্রও কৃপা করত না। ধর্মের ভয় মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে, যজমানদের কাছ থেকে একটু বেশী পরিমানে আয় করার দিকে ঝোঁকটা বেশীই ছিল - এই সমস্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের।

এই সম্প্রদায়ের কিছু লোক আরও একধাপ এগিয়ে সমাজের বুকে লোভের স্বীকার হয়েছে। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা অতিরিক্ত প্রাপ্তির আশায় শ্রাদ্ধবাসরে প্রেত অন্ন

ভোজন করে অধিক দক্ষিণা গ্রহণ করে। শ্রাদ্ধাদিকর্মে নিজেদেরকে নিয়োজিত ও দান গ্রহণের ফলে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদেরকে অগ্রদানী বা 'কল্টাহা' বলা হয়। বর্ত্তমানে অনেক অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরা আচার্য্য পদবী গ্রহণ করেছে। পূর্বের পদবী ছিল ঝা, মিশ্র ইত্যাদি। কর্মফলস্বরূপ এই শ্রেণীকে মৈথিল সমাজ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। এখনও মালদহে বসবাসকারী এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা নিজেদের পদবী 'ঝা' ব্যবহার করছে। শ্রাদ্ধাদিকর্মে উপস্থিত অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরা গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করলে অথবা তাদের ছায়া মাত্র (পদক্ষেপ দূরে থাক) বাস্তুতে পড়লে, ঘরের ভাতের হাঁড়ি, (মাটীর) ফেলে দেওয়া হত। অন্যান্য ভাতের এঁটো বাসন-পত্র ধুয়ে ফেলার প্রচলন ছিল। এই শ্রেণীর সমাজচ্যুত অগ্রদানী সম্প্রদায় মালদহের বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করছে ও নিজেদেরকে 'ঝা' পদবী দিয়েই পরিচিতি প্রদান করছে। যে সমস্ত গ্রামে এদের বাস তা হল - বাবলা (সুরেন্দ্রনাথ ঝা ও পরিবার), সিমলা, একবর্ণার কাছে বেতাহা গ্রামে (কৃষ্ণলাল ঝা, তার সন্তানেরা ও পরিবার) ইত্যাদি। এর মধ্যে অনেকে অগ্রদানী পেশা ত্যাগ করে হাতুড়িয়া ডাক্তার, গায়ক, ইত্যাদি পেশায় নিযুক্ত রয়েছে। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে আগেকার সেই বাধ্য বাধকতা মানা হচ্ছে না অথবা প্রাচীনকালের মত কঠোর সামাজিক মনোভাব বর্ত্তমান প্রজন্ম মানতে রাজী নয়। ফলে ঘটে চলেছে অবাধ মেলামেশা ও যাতায়াত। এখন আর অগ্রদানী বলে কিছু নেই এবং কর্মের ভিত্তিতে কোনও বিভেদ মানা হয় না। এই শ্রেণীর লোকেরা অন্য শ্রেণীদের বাড়ীতে সাগ্রহে গৃহীত হয় ও এর জন্য আর ভাতের হাঁড়ি ফেলে দেওয়ার প্রথাও বিলুপ্ত হয়েছে। তবে এখনও পর্য্যন্ত মৈথিলী সমাজের সঙ্গে কোনও প্রকার সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে নি।

আর এক শ্রেণীর পুরোহিত ব্রাহ্মণদের সন্ধান পাওয়া যায় - এরা নীচ যাজী। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদেরকে অর্দ্ধ-সমাজচ্যুত করা হয়েছিল। শূদ্রদের বাড়ীতে কোন ব্রত অনুষ্ঠান বা পূজা পার্বনে যাজন বৃত্তি করাতে বিশেষ দোষের ছিল না ;

জাতকর্ম ইত্যাদি নিচুমানের অনুষ্ঠান করায় ও দক্ষিণা গ্রহন করায়, এই শ্রেণীকে নীচু-যাজী বলা হয়। কিন্তু বর্ত্তমানের শিক্ষাধারা এই সমস্ত প্রথার বিলোপ ঘটিয়েছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের সন্তানদেরকে বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত দেখা যাচ্ছে ও সংসারে সুচ্ছলতা এসেছে। পুরাতন বৃত্তি যজন-যাজন ত্যাগ করে, যারা এককালে তাদেরকে সমাজচ্যুত করে রেখেছিল বিশেষ করে সামাজিক ব্যাপারে, তারাই বর্ত্তমানে তাদের সঙ্গে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে সচেষ্ট। এই শ্রেণী আর অর্দ্ধ-সমাজভুক্ত নয় এবং নীচযাজী বলেও ঘৃণিত নয়। বরং উল্টোভাবে পুরোপুরি সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করে, অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক অনেক ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বৃত্তিগত কারণেই হোক্ আর অন্যকোনও কারণেই হোক্ - এই সম্প্রদায়ের শিক্ষার ধারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন খাতে বয়ে চলতে দেখা গেছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল সংস্কৃত শিক্ষার। দ্বারভাঙ্গা ছিল বঙ্গ-কামরূপ-ত্রিপুরা-শ্রীহট্ট-এমনকি উড়িষ্যার কিয়দংশ, সংস্কৃত ও অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্রভূমি। এখানকার অনেক ন্যায়রত্ন - স্মৃতিরত্ন - ব্যাকরণ প্রভাকর, প্রভৃতি পন্ডিত ব্যক্তিদের পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও নবদ্বীপে দ্বারভাঙ্গার প্রখ্যাত পন্ডিত গোবিন্দ উপাধ্যায় কৃত স্মৃতি শাস্ত্রের পঠন-পাঠন অব্যাহত রয়েছে। পন্ডিতদের হাতে লেখা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অন্যান্য গ্রন্থ শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা স্থানে ব্যাপকভাবে পাওয়া যাচ্ছে। অনুসন্ধান চালান কালীন অবস্থায় একটা ব্যাকরণ পুঁথি আমার হস্তগত হয়েছে। এই পুঁথিটি হাড়িয়াগড় গ্রাম নিবাসী বিপিনচন্দ্র ঝা মহাশয়ের কনিষ্ঠতম পুত্র অখিলচন্দ্র ঝা -এর নিকট থেকে পেয়েছি। এই পুঁথিটির লেখার তারিখ সহ প্রামাণিক তথ্য হিসাবে ফটোকপি উপস্থিত করা হল। (কপি-১)

হাতে লেখা পুঁথিতে প্রাপ্ত তারিখ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই সময়ে ছাপাখানার প্রচলন বিশেষ একটা ছিল না। আজকালের মত ঝরণা কলম, ইত্যাদির আবিষ্কার হয়নি। খরের, অথবা পালকের কলমের প্রচলন ছিল। কালি হিসাবে ব্যবহৃত হত - হরীতকী - আমলা(আমলকী), তুঁত ইত্যাদি ফলকে মাটীর হাঁড়িতে নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত পচান দিয়ে তৈরী একপ্রকার কষায় গাঢ়ীয় রং। এই কালির রং কালো, যা কিনা আধুনিক যুগে চীনের কালি বা চাইনীজ ইঙ্ক্ হিসাবে পরিচিত। তখনও কাগজের আবিষ্কার ব্যাপক ছিল না। ফলে তালপাতা, কলাপাতা ইত্যাদি কাগজ হিসাবে রূপান্তরিত করে তাতেই লেখনীর কাজ চলত। তালপাতার কাগজ তৈরী করার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম হত। তালপাতার উপরের আচ্ছাদনকে কৃত্রিম প্রক্রিয়া দ্বারা তুলে দিয়ে ভিতরের শাঁসযুক্ত অংশকে কাগজ হিসাবে ব্যবহার করা হত। বিশেষ ধরনের কলাপাতা থেকেও কৃত্রিম উপায়ে কাগজ তৈরী করা হত। এই ধরণের তৈরী কাগজের পুঁথিগুলিতে যথাক্রমে ব্যাকরণ - পূজা পদ্ধতি, শ্রীশ্রী চন্ডী, কালীপূজা, উপাখ্যান ইত্যাদি। এই সমস্ত দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি ও প্রমাণস্বরূপ এই পুঁথির ফটোকপি (২ ও ৩ নং) উপস্থাপিত করা হল। কোনওরূপ রূপান্তর না ঘটিয়ে শুধু তালপাতায় লেখা পুঁথি মালদহ শহরের বিনয় সরকার রোডের প্রাচীন অধিবাসী সুনিতীবালা দেবীর কাছ থেকে আমার হস্তগত হয়েছে - ফটোকপি দাখিল করিলাম (নং ৪)।

১৯৮১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী এই জেলার জনসংখ্যার যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে যে - [১৬]

মোট জনসংখ্যা - ২০, ৩১, ৮৭১ জন
পুরুষের সংখ্যা - ১০, ৪২, ৪৯৬ জন
স্ত্রীর সংখ্যা - ৯, ৮৯, ৩৭৩ জন

---

(১৬) District Census Hand Book (Part XIII-B), Malda District, Census of India - 1981, Series - 23, West Bengal.

এর মধ্যে মৈথিলী সম্প্রদায়ের

মোট জনসংখ্যা - ১৬, ০০১ জন

পুরুষের সংখ্যা - ০৮, ৭৬১ জন

স্ত্রীর সংখ্যা - ০৭, ২৪৮ জন

উপরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রমান পাওয়া যাচ্ছে যে মালদহে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার তুলনায় এই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা অত্যন্ত কম। ফলে মোট জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে অত্যন্ত লঘু সংখ্যা বিশিষ্ট এই - সাম্প্রদায়কে মালদহের মধ্যে "সংখ্যালঘু" সম্প্রদায় হিসাবেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই সম্প্রদায়ের ভাবধারা বিচার করে দেখা যাচ্ছে যে - এরা শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী। অনুসন্ধানে আরও দেখা গেছে যে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ত্তমানে নিম্নতম শিক্ষার মান মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এবং আরও উচ্চতর শিক্ষার দিকে এগিয়ে চলেছে। উচ্চতর শিক্ষা প্রাপকদের সংখ্যাও কম নয়। ফলে শিক্ষার মান এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে এবং একমাত্র প্রাচীনা বা বৃদ্ধা ছাড়া কম বেশী শিক্ষার আলো প্রত্যেকের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গেই বলতে পারা যায় যে অফরজ্ঞানের পরিচয়ে এই সম্প্রদায় বেশ এগিয়ে রয়েছে। শিক্ষিতের হার নিম্নতম মান, মাধ্যমিক স্তরকে ধরে এই সম্প্রদায়ের পুরুষ - ৩৫ ও স্ত্রী ১৭ এই হার কম হওয়ার একমাত্র কারণ - কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত গ্রামে ও গ্রামাঞ্চলে উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব কম ছিল। স্ত্রী শিক্ষার প্রতি এই সম্প্রদায়ের উদাসীনতা। অন্যভাবে বলা যায় যে সম্প্রদায়ের লোকেরা নারীদেরকে পর্দানসীন (Conservative) করে রেখে ছিল। বর্ত্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলে বা সম্পন্ন গ্রামেই প্রায় উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। যুক্ত শিক্ষা-মাধ্যমের (Co-education) পদ্ধতিতে ছেলে ও মেয়ে একসঙ্গে পড়াশুনা করতে পারছে। আবার

আড়াইডাঙ্গা প্রভৃতি উন্নতিশীল গ্রামে মেয়েদের জন্য আলাদাভাবে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে আবার যুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাও প্রচলিত রয়েছে। কয়েকটা উচ্চ বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন যায়গায় উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রসার ঘটেছে। বর্ত্তমানে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সরাসরি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষা লাভ করা একটা প্রতিযোগিতার আকার ধারণ করেছে। প্রতিযোগিতার বহর দেখে একটু চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। এই শিক্ষার মূল্যায়ন কি শুধু ডিগ্রি অর্জন করা, না জ্ঞান লাভ করা ?

মালদহ জেলায় সামগ্রিকভাবে বসবাসকারী জনগণকে দুইটি সম্প্রদায়ে ভাগ করা চলে - উচ্চ-সম্প্রদায় ও নিম্ন সম্প্রদায়। উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যায় - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (সিংহ বা রাজপুত) নাগর, নাপিত, কুন্ডু, কাঁসারী, সাহা(সুরী বাদে), মাড়োয়ারী, (অনেকে আবার দাস পদবী গ্রহণ করেছে), কর্ম্মকার, প্রভৃতি। মুসলমানদের মধ্যে যারা খান, মহম্মদ, ঘোষিণ, সিয়া, সুন্নি, মোগল, পাঠান, প্রভৃতি।

নিম্ন বা নীচু সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যায় - বাগ্দী, দুলে, বক্সর, বাউরি, বেলদার, ভোগতা, ভুঁইমালী, ভুঁইয়া, বিন্দ, চামার, চাঁপন, ধোবা, দোয়াই, ডোম, ধাঙ্গর, দোসাদ, ধারী ঘরি, গনতী, হারী, মহার, ভাঙ্গী, জালুয়া - কৈবর্ত্ত, ঝালো-মালো, কড়ার, কাঞ্জার, কউরা, কাউর, কেওট, খারিয়া, ঘটক, কোচ, কোণাই, কোঙার, কোটাল, করবিয়ার, লোহার, মহয়, মাল, মাল্লা, মুসহর, নমশূদ্র, নুনিয়া, পোলিয়া, পাণী, পাটনী(খাটোয়াল), পোদ্বা, পুন্ড্র, রাজবংশী, রাজোর, সুরী(সাহা বাদে), তিওর, তুরী, সাঁওতাল, দোসাদ, প্রভৃতি। এছাড়া মঙ্গোলিয়ান শাখাভুক্ত কিছু নেপালীরও বসবাস রয়েছে।

এককথায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যত প্রকার জাতি রয়েছে - প্রায় সমস্ত জাতিরই শাখা বা উপশাখার অবস্থিতি মালদহে দেখতে পাওয়া যায়। এর মূল কারণ খুঁজতে হলে পিছনের দিকে তাকাতে হবে। বিশেষ করে গৌড় রাজ্য সৃষ্টির সময় থেকে বিভিন্ন রাজারা বিভিন্ন সময়ে গৌড় আক্রমণ করে সিংহাসন দখল করেছেন। সঙ্গে আসা সৈন্য ও লোকলস্কর রাজার অধীনে থেকে রাজ্যের প্রশাসন কর্ম পরিচালনা করে। এইভাবে রাজাদের পরিবর্তন ঘটতে থাকে ও সঙ্গে আসা লোকজন এখানেই থেকে যায়। ~~পরে থাকে ও সঙ্গে আসা লোকজন এখানেই থেকে যায়।~~ পরে রাজ্যজয়ে আগত লোকজনেরা সমগ্র গৌড়ের বিভিন্ন স্থানেই বসবাস করে। তাদের বংশধারা পুরুষানুক্রমে বসবাস করে আসছে। মুসলমান আমলেও আগমনকারীরা এখানে বসবাস করছে ও নীচু সম্প্রদায়ের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরকে মুসলমান করে এখানে বসবাস করছে। এই প্রকার হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলমানের ধর্মে রূপান্তর ব্যাপকভাবেই ঘটেছে ও তারা বিভিন্ন প্রত্যন্তে বসবাস করছে। আবার সামান্য কয়েকঘর গোয়ালার বাস রয়েছে, বিশেষ করে রায়পুর অঞ্চলে, তারা মুসলমান ধর্মে রূপান্তরিত হয়নি, কিন্তু হিন্দু বা মুসলমান উভয়সমাজ থেকেই বহিষ্কৃত হয়ে, উভয় ধর্মকেই মান্যতা করে বসবাস করছে। এইসমস্ত পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে মালদহ জেলা একটা জনসমুদ্রের আধার অর্থাৎ এখানে বসবাসকারী জনজীবনকে সাগর হিসাবে বললে ভুল হবে না। বিভিন্ন নদীর জলধারা যেমন সাগরের জলের সঙ্গে মিশে গিয়ে স্থির হয়, তেমনি বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত লোকজন গৌড়ে তথা মালদহে এসে, এখানকার জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়েছে এবং স্থানীয় অধিবাসীর সঙ্গে মিলেমিশে সহাবস্থান করে চলেছে। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত নানা শ্রেণীর লোকেদের বর্তমান পরিচয় মালদহের অধিবাসী হিসাবে।

এহেন মালদহে আগমনকারী মৈথিলী সম্প্রদায়ের, যারা ভূস্বামী নয়, এই শ্রেণীর লোকেরা জীবিকা হিসাবে যাজন বৃত্তিকে গ্রহণ করলেও, প্রথম থেকেই শিক্ষার দিকে

এগিয়ে চলেছে। শিক্ষিতরা বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকতা ও অন্যান্য সংস্থার কাজেকর্মে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা পুরোহিত বৃত্তিকে নিজেদের জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল, সামাজিক বিভিন্ন কারণে এই বৃত্তি থেকে তারা সরে এসেছে বা সরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মূল ভূখন্ড মিথিলা থেকে মালদহে এসে এখানকার জীবনধারার সঙ্গে নিজেদেরকে মিশিয়ে দিয়েছে। আবার অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে, বিভিন্ন দিক দিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। প্রথমে, এদেশীয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির চেয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি অনেক উন্নত এবং অন্যান্যরা সংস্কৃতিহীন। হীন সংস্কৃতি যুক্ত সম্প্রদায়ের সুযোগ গ্রহণ করে ব্রাহ্মণেরা তাদের সংস্কারক হিসাবেই নিজেদেরকে প্রকাশিত করে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার পূর্বে নিম্ন সম্প্রদায় অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকর্ম নিজেরাই নিজেদের প্রথা অনুসারে সম্পন্ন করত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বিস্তার লাভ করার ফলস্বরূপ, বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ক্রিয়াকর্মে দ্বৈত মতবাদ - এই সময় থেকেই প্রকাশিত হয়। তাই এরা, নিজেদের চিরাচরিত প্রথাকে বজায় রেখে, পুরোহিত ব্রাহ্মণদের দেওয়া বিধানকে নিজেদের সংস্কৃতির মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটায়। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার মাঙ্গলিক, পারলৌকিক ও পারিবারিক ক্রিয়া-কর্ম, যা তারা এতদিন নিজেদের মত অনুসারে সম্পন্ন করত, তার মধ্যে পুরোহিত ব্রাহ্মণদের দেওয়া বিধান-গুলির অনুপ্রবেশ ঘটাল ও নূতন মতবাদ বা বিধানকে অনুসরণ করতে লাগল। ব্রাহ্মনেরাও এই সুযোগ ভাল ভাবেই গ্রহণ করল। নিজেদের আয়ের পরিমাণ বাড়াবার মানসে নিত্য নূতন বিধান দিতে লাগল। এইভাবে নিজেদের বিধানকে তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটাল। অনুরূপভাবে তাদের আচরিত উন্নতশ্রেণীর বিধানকে নিজেরা গ্রহণ করল - বিশেষ করে বিভিন্ন প্রকার আচার আচরণ।

সহাবস্থানের ফলে বিভিন্ন প্রকার বিধানের ধারা এই সম্প্রদায়ের লোকেরা যেমন অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ, তেমনি অন্যান্য সম্প্রদায়ে কিছু ধারাকে নিজেরাও গ্রহণ করেছে। বাহ্যিক দিক দিয়ে সহাবস্থানের মর্য্যাদা রক্ষা করে চললেও, গুহ্য বা অন্তর্নিহিত তথ্য এই যে বহিঃপ্রকাশ যাই ঘটুক, অন্দর মহলের চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। অন্তর্মুখী ভাবে নিজেদের চিরাচরিত সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এখনও পালন করে চলেছে।

এই আলোচনার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখাতে চেষ্টা করব, এই সম্প্রদায় ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধে।